প্রাগ্‌-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত।

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

(For Pre-University Course)

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. ফিল.,
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৬৭

মুদ্রাকর : শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

লেখকের কথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট প্রাগ্-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হইল। এই পুস্তিকায় অতি সংক্ষেপে মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 'ভূমিকা'টি পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত হইলেও কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রাগ্-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠের জন্য পাঁচ মাসের অধিক সময় পাইবে বলিয়া মনে হয় না। তাই তথ্যের বাহুল্য বা গ্রন্থ-তালিকার বহর না বাড়াইয়া বাংলা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তিকাটিকে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করিয়া লিখিবার জন্য আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রীগণ বিস্তারিতভাবে জানিবার প্রয়োজন বোধ করিলে এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১ম) এবং 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য' পড়িয়া দেখিতে পারে।

আমার প্রীতিভাজন ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় এই পুস্তিকার প্রেসকপি তৈয়ারী করিয়া দিয়া আমার ভার লাঘব করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমান্‌কে স্নেহাশীর্বাদ জানাইতেছি।

যাহাদের জন্য পুস্তিকাটি রচিত হইল, তাহারা উপকৃত হইলে সুখী হইব। ইতি শ্রাবণ, ১৩৬৭

বাংলা সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১৩৬৭ ॥ ১৯৬০

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

Syllabus

History of Bengali Literature

20 Marks

Mediaeval Bengali—Mangal-Kavya (Manasamangal, Chandimangal, Dharma-mangal), Translation literature (Ramayan & Mahabharat), Sri Chaitanya—his life and biographies. Lyrics—Vaishnava & Sakta.

Modern Bengali—Development of prose—some landmarks in Bengali prose of the 19th Century (Carey, Rammohan, Iswarchandra, Pyarichand Mitra, Akshaykumar Datta, Bhudev Mukhapadhyay, Bankimchandra, Ramendrasundar), A short history of the Bengali drama and the stage (Madhusudan, Dinabandhu, Girischandra and D. L. Roy), Novel and short stories (Bankimchandra, Rameschandra, Probhatkumar), Poetry (Madhusudan, Beharilal, Hemchandra, Nabinchandra),

ভূমিকা*

বাঙলাদেশ, বাংলাভাষা ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য

বাঙলাদেশের কথা ॥

উত্তরে তুষারমৌলি হিমালয় ও তৎসন্নিহিত নেপাল, সিকিম ও ভুটান; উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিমে দ্বারবঙ্গ; পূর্বে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তীয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের শৈলসানু, পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল-পরগণা—ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূমের রুক্ষ ঊষর মাটি; দক্ষিণে কলমন্দ্র-মুখর বঙ্গোপসাগর। এই আমাদের বাঙলাদেশের সীমা, বাংলাভাষারও সীমা। রাজনৈতিক কারণে বাঙলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হইলেও ভাষা ও সংস্কৃতির উপর প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাঙালীজাতির প্রাণ-মন-সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত অখণ্ড ও অব্যাহত।

প্রাচীন যুগে আর্যগণ পূর্ব-ভারতবর্ষকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন না। এদেশে অনার্য জাতি বাস করিত। তাহাদের ধর্ম-কর্ম-আচার-ব্যবহার আর্যদের পছন্দ হইত না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আর্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বাঙলা-দেশের দিকে আসিতে আরম্ভ করিলেন; এদেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের ঘৃণাও

---

* এই অংশটুকু পাঠ্যতালিকাভুক্ত নহে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে আদিপর্ব সম্বন্ধে দুই-চারি কথা জানিয়া রাখা ভাল। তাই কৌতূহলী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এই "ভূমিকা" সংযোজিত হইল।

লোপ পাইল। বাঙলাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তযুগে বাঙলাদেশ আর্যসংস্কৃতির যথার্থ সংস্পর্শে আসে। গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত নামক একজন বাঙালী রাজা নিজ রাজ্যের বাহিরে উত্তরাপথে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাঙলাদেশ ভীষণ অরাজকতার সম্মুখীন হইল। পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব নিজ প্রতিভাবলে বাঙলাদেশকে আবার শৃঙ্খলার মধ্যে আনিলেন। এই পালবংশ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত—প্রায় চারি শত বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশে পরম গৌরবে রাজত্ব করিয়াছিল। পারিবারিক কলহ ও সামন্তচক্রান্তের ফলে পালসাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল। তখন দক্ষিণ-ভারত হইতে আগত এক ব্রাহ্মণ বংশ (সেন বংশ) বাঙলাদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইল। বল্লালসেন ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র লক্ষ্মণসেন সেনবংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইঁহারা মোট সাতাত্তর বৎসর বাঙলাদেশে রাজত্ব করেন। তারপর ১২০২ বা ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইফ্‌তিকার উদ্দিন বিন্-বখ্‌তিয়ার নামক এক তুর্কী ভাগ্যান্বেষী অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে বাঙলার রাজধানী নবদ্বীপে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতে রাজপুরী আক্রমণ করেন। তাঁহার পশ্চাতে বহু তাতার-তুর্কী-খোরাসানী অশ্বারোহী সেনা আসিয়াছিল। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া আত্মীয় পরিজনসহ বিক্রমপুর যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পশ্চিম-বাঙলার কিয়দংশ মুসলমান জাতির করতলগত হয়। ক্রমে বাঙলার প্রায় সমস্তটাই ইঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। পাঠান সুলতান ও মুঘল সম্রাটগণ প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙলাদেশ শাসন করিয়াছেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর বাঙলাদেশে মুসলমান রাজশক্তির অবসান হইল এবং বণিক ইংরাজ এদেশের শাসক হইয়া বসিল; ক্রমে সমগ্র ভারত এই শ্বেতজাতির

পদানত হইল। তারপর আবার কালের চক্র ঘুরিল, ১৯৪৭ সালে ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া গেল। ইংরাজ-আধিপত্যের কাল প্রায় দুই শত বৎসর।

বাংলা ভাষার কথা॥

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম গিরিপথ পার হইয়া আর্যজাতির এক শাখা পশ্চিম-পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয়। তাহাদের পূর্বে এদেশে কোল-ভীল-সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যজাতি এবং দ্রাবিড় নামক সুসভ্য জাতি বাস করিত। আর্যদের সঙ্ঘশক্তি, কর্মঠস্বভাব, কল্পনা-কুশলতা এবং পরিবেশের সঙ্গে মানাইয়া লইবার শক্তির নিকট দ্রাবিড় ও কোল-ভীলগণ পরাভূত হইল; কেহ কেহ আর্যদের সঙ্গে মিশিয়া গেল, কেহ-বা অরণ্যপর্বতে পলাইয়া গিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিল। খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের দিকে আর্যগণ তাঁহাদের ভাষায় বেদ রচনা করিলেন, গল্প-কাহিনী লিখিলেন। বৈদিক ক্রিয়াকর্মে তাঁহারা 'ছান্দস্' ভাষা ব্যবহার করিতেন; ইহাকে বৈদিক ভাষাও বলে। আর একটি ভাষায় কাব্য-কাহিনী রচিত হইত; খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে পাণিনি সেই ভাষাটির সংস্কার সাধন করেন। তখন ইহার নাম হয় 'সংস্কৃত' ভাষা—অর্থাৎ যে-ভাষার সংস্কার করা হইয়াছে। সংস্কৃতভাষা আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের (বাংলা, হিন্দী, আসামী, ওড়িয়া, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি) প্রপিতামহী।

কালক্রমে লোকমুখে সংস্কৃতভাষার বিশুদ্ধি নষ্ট হইয়া গেল; এই ভাঙা-সংস্কৃতের নাম 'প্রাকৃত'। প্রাচীন ভারতে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ ছিল, ইহাতে কাব্য-নাটকও রচিত হইয়াছিল। মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও অর্ধ-মাগধী—প্রাকৃতের এই চার প্রকার রূপ। প্রাকৃতভাষা পরবর্তিকালে আরও শিথিল হইয়া পড়িল এবং ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রায় লোপ পাইল। তখন ইহার নাম হইল 'অপভ্রংশ'। অপভ্রংশ ভাষা জনসাধারণের

কথিত ভাষার কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেক প্রাকৃত হইতে একটি করিয়া অপভ্রংশের উৎপত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে। যথা—মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত হইতে মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ, শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশ। ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষা এই সমস্ত অপভ্রংশ হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছে। আমাদের বাংলাভাষার উৎপত্তিস্থান মাগধী অপভ্রংশ। খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর নিকটবর্তি-কালে প্রাদেশিক ভাষাসমূহ অপভ্রংশের প্রভাব ত্যাগ করিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে আরম্ভ করে।

গত ১৯৫১ সালের আদম-শুমারিতে দেখা গিয়াছে যে, সারা ভারতে প্রায় আড়াই কোটী লোক * ঘরে ও বাহিরে বাংলাভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করে এবং লিখিত গ্রন্থ বুঝিতে পারে। অবশ্য বাঙলাদেশের ভৌগোলিক আঞ্চলিকতা অনুসারে কিছু কিছু উপভাষাও (dialect) আছে। পশ্চিম-বঙ্গ, দক্ষিণ- ও পূর্ব-বঙ্গ, উত্তর-বঙ্গ ও উত্তর-পূর্ববঙ্গ —বাঙলাদেশের এই চারিটি অঞ্চলের জনসাধারণ চারি প্রকার উপভাষায় কথা বলে। উপভাষাগুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ইহারা মূল বাংলাভাষার গোত্র হইতে উৎপন্ন। বাঙলার উপভাষা কেবল কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়, ইহাদের বিশেষ কোন সাহিত্যগৌরব নাই।

এই প্রসঙ্গে সাধুভাষা ও চলিতভাষা সম্বন্ধে দুই-এক কথা জানিয়া রাখা ভাল। সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সম্প্রসারণ এবং ভাষাভঙ্গিমায় সংস্কৃতগন্ধী গুরুভার শব্দবিন্যাস সাধুভাষার প্রধান লক্ষণ। তাই ইহাকে বাহ্যতঃ একটু কৃত্রিম ও পোষাকী বলিয়া মনে হয়। আধুনিক কালের সাহিত্যে চলিতভাষার সমাদর দেখা গেলেও এখনও পর্যন্ত সাধুভাষাই বাঙলাদেশের সরকারী ভাষা, আপিস্-আদালত কাজকর্মের বাহন।

* ভারত য়ুনিয়নে বাংলাভাষা জনসংখ্যা—২৫,১২১,৬৭৪। ভারত ও পাকিস্তানের বাংলা-ভাষী জনের মিলিত সংখ্যা সাত কোটীর উপর।

চলিতভাষা মূলতঃ পশ্চিম-বঙ্গের কথিত ভাষার সাহিত্যিক রূপান্তর। কৃষ্ণনগর হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতা পর্যন্ত অঞ্চলের শিষ্টজনে যে ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, তাহাকে একটু মার্জিত করিয়া সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়। ইহাকে চলিতভাষা বা Standard Literary Dialect বলে। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাংলা সাহিত্যে চলিতভাষা অল্পস্বল্প ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ খাস কলিকাতার বুলিতে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' রচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'সবুজপত্রে'র (১৯১৪) সাহায্যে সাহিত্যক্ষেত্রে চলিতভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এখন চলিতভাষা সাধু ভাষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু চলিত-ভাষা লোকের অবিকল মুখের কথা নহে। ইহাও সাধুভাষার মত সাহিত্যের ভাষা,—দৈনন্দিন জীবনের ভাষা নহে। বস্তুতঃ মানুষ যে-ভাষায় কথা বলে, তাহাকে ঠিক সেইরূপ অবিকৃতভাবে সাহিত্যে ব্যবহার করা দুরূহ। তাই বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত চলিতভাষাকে সাহিত্যের ভাষারূপেই গণ্য করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' এবং প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের ভাষা চলিতভাষা হইলেও সাধুভাষার মত গুরুভার।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ॥

প্রাচীনতম বাংলাগ্রন্থের নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে এই পুঁথিখানি সংগ্রহ করেন। চর্যাপদ খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাতে অন্ততঃ পঞ্চাশটি পদ ছিল; কিন্তু সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ উদ্ধার করা গিয়াছে। প্রায় ২৩ জন বৌদ্ধ-সহজিয়া কবি এই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীনতম বাংলাভাষায় রচিত বলিয়া এখন অনেকে ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। উপরন্তু বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এই ভজন গীতিকা-

গুলিতে এমন দুর্বোধ্য ইঙ্গিত ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহার তাৎপর্য অনুধাবন করাই দুষ্কর। অবশ্য অন্তর্নিহিত অর্থের কথা ছাড়িয়া দিলেও কতকগুলি পদে প্রশংসনীয় কবিত্ব লক্ষ্য করা যাইবে। বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা গীতিপ্রাণতা (lyric); ইহাতে সেই গীতিপ্রাণতার সার্থক সুর অনুরণিত হইয়াছে। সর্বোপরি ইহার রূপক-প্রতীকের আড়ালে নদী-মাতৃক বাঙলাদেশ ও দরিদ্র বাঙালীর সমাজচিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মুসলমান আধিপত্যের প্রথম দিকের প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া বাঙলার সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পরে সামস্‌-উদ্দিন-ইলিয়াস্‌-শাহ্‌ ও তাঁহার বংশধারার সুশাসনে (১৩৪২-১৪১৩ খ্রীঃ অঃ) বাঙলাদেশের সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতির অরাজকতা কাটিয়া গেল, অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে আবার সাহিত্যরচনা আরম্ভ হইল। খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি হইতে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল।

মধ্যযুগের প্রথম দিকে কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি বাঙালী নহেন, মিথিলার (আধুনিক দ্বারভাঙ্গা) অধিবাসী। তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী মৈথিলী ভাষায় লিখিত হইলেও একদা বাঙলা-দেশে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চৈতন্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, বাঙলার সকল মহামানব বিদ্যাপতির গুণগান করিয়াছেন। তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সুহৃদ্‌ ও সভাকবি ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি মিথিলার সীমা ছাড়াইয়া অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অমর করিয়াছে। বাঙালী ছাত্রেরা একদা মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে যাইত। খুব সম্ভব তাহারাই বাঙলাদেশে বিদ্যাপতির পদ জনপ্রিয় করিয়াছিল। শুধু বাঙলাদেশেই নহে,—আসাম ও উড়িষ্যাতেও বিদ্যাপতির খ্যাতি সর্বজন-

বিদিত ছিল। অনেক কবি তাঁহার অনুকরণে পদ লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অত্যধিক জনপ্রিয়তার ফলে তাঁহার অনেক পদের ভাষা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ১৪শ শতাব্দীর একখানি বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ। প্রাচীন সাহিত্য-বিশারদ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম হইতে এই কাব্য আবিষ্কার করেন। ইহার পুঁথিটি অত্যন্ত প্রাচীন। কয়েকখানি পাতাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাজেই কাব্যটির প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। বসন্তরঞ্জনবাবু ইহার নাম দেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। কিন্তু মূল পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত এক টুকরা কাগজে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নাম পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক এখন এই কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামেই পরিচিত। কবি বড়ু চণ্ডীদাস ইহা রচনা করেন। তিনি বাসুলী দেবীর সেবক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত আর-কোন সংবাদ জানা যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের ফলে বাংলা সাহিত্যে 'চণ্ডীদাস সমস্যা' নামক এক উৎকট সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙলাদেশে বহুকাল হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সুর ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; চণ্ডীদাসের পদাবলীর সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য নাই। চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রেম, ভক্তি ও মনগলানো সুর ইহাতে অনুপস্থিত। বড়ু চণ্ডীদাস প্রথম শ্রেণীর কবি হইলেও এই কাব্যে এমন সমস্ত স্থূল বর্ণনা আছে যে, পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভক্ত-পাঠক এই কাব্য পড়িয়া খুশী হইতে পারিবেন না। তাই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, বাঙলাদেশে অন্ততঃ দুই জন চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন। প্রাচীনতর চণ্ডীদাসই বড়ু চণ্ডীদাস—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি। ইনি বোধহয় চৈতন্যদেবের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরবর্তিকালের চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক অসংখ্য উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ইনি দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস বা পদাবলীর চণ্ডীদাস নামে পরিচিত। ইহার পদাবলীর স্নিগ্ধমধুর

সুর ও ভক্তির প্রগাঢ়তার জন্য পূর্বোল্লিখিত বড়ু চণ্ডীদাসের ঈষৎ অমার্জিত রুচির কাব্য (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) কালে লুপ্ত হইয়া যায়।

চৈতন্যদেবের পূর্বে বর্ধমানের কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু নামক আর-এক কবি ভাগবত অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করিয়াছিলেন। কবিত্বশক্তির জন্য গৌড়ের এক সুলতান ইঁহাকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নহে, মালাধর কয়েকটি স্কন্ধের ঘটনা নিজের ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। চৈতন্যদেব ইঁহার গ্রন্থের বিশেষ সমাদর করিতেন।

প্রথম খণ্ড ঃ মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তিনটি প্রধান ধারার পরিচয় পাওয়া যায়—মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য ও অনুবাদ-সাহিত্য। আরও কিছু কিছু শাখাপ্রশাখা ছিল বটে, কিন্তু সেগুলি কোন-না-কোন দিক দিয়া উক্ত তিনটি প্রধান ধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য একান্তভাবে দেবনির্ভর। মধ্যযুগে (১৪শ-১৮শ শতাব্দী) প্রায় চারি শত বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে দেবতা, দেবতার অবতার বা দেবকল্প মানবের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান শাসনের অবসান হইলে দেশ ইংরাজ বণিকের অধিকারে আসিল; দেশের সমাজ ও জীবনের যেমন বিপুল পরিবর্তন হইল, তেমনি সব দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যেও নূতনত্বের সূচনা হইল। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাঙালীর সাহিত্য দেবতাকে ত্যাগ করিয়া মানুষের দ্বারে দাঁড়াইল। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেবতার প্রাধান্য, ইংরাজ-রাজত্বে রচিত আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে মানুষের আধিপত্য।

১৩শ শতাব্দী হইতে বাঙলাদেশে লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্য অবলম্বনে দীর্ঘ কাহিনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল। ইহা 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত। অবশ্য ১৫শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোন মঙ্গলকাব্যের পুঁথি পাওয়া যায় নাই। তবে অনুমান হয় যে, ১৩শ বা তাহারও পূর্ববর্তী যুগে ছড়া, পাঁচালী, মেয়েলি ব্রতকথার অনুরূপ

মঙ্গলকাব্যের কাহিনী বাঙলাদেশের নিম্নবর্ণ ও স্ত্রীসমাজে প্রচলিত ছিল। দেশ দ্রুতবেগে আর্যভাবাপন্ন হইয়া গেলেও সমাজের নিম্নস্তরে ও পরিবারের অন্তঃপুরে সে প্রভাব সহজে প্রবেশ করিতে পারিল না। সমাজের উচ্চশ্রেণী যখন আর্যদের পূজা অর্চনা ও পুরাণ-সংহিতা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল. তখন বাঙলার মহিলারা অন্তঃপুরে বসিয়া মনসা-চণ্ডী-বাশুলী-শীতলার বারব্রত, পূজা-উপাসনা করিতেন। যাহারা ভদ্র সমাজে প্রবেশ করিতে পাইত না, সেই সমস্ত নিম্নবর্ণেরাও এই দেবদেবীর পূজা করিত। পরে হিন্দুসমাজে আর্যপ্রভাব গভীরভাবে প্রবেশ করিলেও স্থানীয় দেবদেবীর পূজা-উপাসনা বিশেষ হ্রাস পায় নাই। পরবর্তিকালে পুরাণ-লেখকগণ এই অপৌরাণিক দেবদেবীকে সংস্কৃত পুরাণের মধ্যে স্থান দিয়া পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর পার্থক্য দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। বিষ্ণু-শিব-দুর্গা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবীর প্রাধান্যের সময়েও অ-পৌরাণিক মনসা-চণ্ডী প্রভৃতি গ্রাম্য দেবীরা নিজেদের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য ভক্তেরাই তাঁহাদের লীলাকাহিনী প্রচার করিয়াছেন। গ্রাম্য দেবদেবীদের লীলাকাহিনী-সংক্রান্ত কাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলা হয়।

মঙ্গলকাব্য কেন 'মঙ্গলকাব্য' নামে অভিহিত হয়, তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। কেহ বলেন, 'মঙ্গল' অর্থে বিজয়। যে কাব্যে দেবতার বিজয় বা মহিমা বর্ণিত হয় তাহাই মঙ্গলকাব্য। কাহারও মতে এক মঙ্গলবারে কাব্য পাঠ আরম্ভ হইয়া আর-এক মঙ্গলবারে শেষ হয়। তাই ইহার নাম মঙ্গলকাব্য। অপর মতে যে কাব্য রচনা, পাঠ ও শ্রবণ করিলে সকলের মঙ্গল হয় তাহাই মঙ্গলকাব্য। সমালোচকদের এই বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কিছু সত্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

১৫শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত (এমন কি ১৯শ শতাব্দীতেও) মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, বাশুলী প্রভৃতি দেবতাদের অবলম্বন করিয়া বাঙলাদেশে

অসংখ্য মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শাক্ত মঙ্গলকাব্যের* সংখ্যাই অধিক।

বাঘ ও কুমীরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায় এবং কুমীরের দেবতা কালু রায়ের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। মনসা উপাসনা করিলে লোকে সর্পাঘাত হইতে বাঁচিতে পারে, কারণ মনসা সর্পের দেবী। চণ্ডীর প্রসাদ লাভ করিলে অস্পৃশ্য ব্যাধও রাজা হইতে পারে। কোন প্রকার আপদবিপদ হইতে বাঁচিবার আশায় লোকে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর পরিকল্পনা করিয়া পূজা করিত, কাহিনী লিখিত, গান বাঁধিত। আমরা এখানে প্রধানত: মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব।

১। মনসামঙ্গলকাব্য

মনসামঙ্গলের কাহিনী॥

শিবের কন্যা মনসাদেবীর লীলামাহাত্ম্য এবং বেহুলার সতীত্ব প্রচারই এই মঙ্গলকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। কোন প্রামাণিক পুরাণে শিবের মনসা নাম্নী কোন কন্যার উল্লেখ নাই। বলাই বাহুল্য যে, পরবর্তিকালে সর্পের দেবী মনসাকে শিবের কন্যায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে। পদ্মবনে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার অপর নাম পদ্মা। তাই মনসামঙ্গল পদ্মাপুরাণ নামেও পরিচিত। শিবের কন্যা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শিব তাঁহাকে কৈলাসে লইয়া আসিলে সৎ-মা চণ্ডীর সঙ্গে মনসার কলহ বাধিল এবং চণ্ডীর খোঁচায় মনসার একচক্ষু কানা হইয়া গেল। মনসা শিবদুর্গার পূজা দর্শনে নিজ পূজা প্রচার ও প্রভাব বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। উচ্চবর্ণেরা তখন শিবের উপাসনা করিত।

* 'শক্তি' অর্থাৎ স্ত্রী-দেবতার মহিমাবিষয়ক মঙ্গলকাব্যকে শাক্ত মঙ্গলকাব্য বলে

সুতরাং তাহারা সহজে স্ত্রী-দেবতা মনসার পূজা করিবে না। তখন তিনি প্রথমে নিম্ন সমাজে পূজাপ্রচারে উদ্যোগী হইলেন। উক্ত সমাজের অনেকে তাঁহার পূজা করিল, বরলাভ করিল। যাহারা করিল না, তাহারা মনসার রোষদৃষ্টিতে মরিল।

গাঙ্গুর নদীর ধারে চম্পাই গ্রামে একজন শিবভক্ত সম্পন্ন বণিক বাস করিতেন। তাঁহার নাম চন্দ্রধর বা চাঁদবেণে। তাঁহার সাতপুত্র, সপ্তডিঙা; ব্যবসাবাণিজ্যে লক্ষ্মী অচলা। লোকে তাঁহাকে সমাজের নেতা বলিয়া মান্য করিত। মনসা দেখিলেন চাঁদবেণে পূজা করিলে সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু পরমশৈব চন্দ্রধর কিছুতেই তাঁহার পূজা করিবেন না। তখন কোপনস্বভাবা দেবী চাঁদকে দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলিলেন। বণিকের ছয় পুত্র মরিল, বাণিজ্যতরী ডুবিয়া গেল; চাঁদ তবু অচল অটল। তাঁহার সপ্তম পুত্র লক্ষ্মীন্দ্র বা লখিন্দরের সঙ্গে উজানী নগরের এক সদাগরের সুলক্ষণা কন্যা বিপুলা বা বেহুলার বিবাহ হইল। মনসা দেবীর চর কালীনাগ বাসরে গিয়া লখিন্দরকে দংশন করিয়া মারিয়া ফেলিল। সাপে-কাটা মড়া লোকে দাহ করে না, কলার ভেলায় নদীতে ভাসাইয়া দেয়। মৃত লখিন্দরকে যখন ভেলায় তোলা হইল, তখন সতীশিরোমণি বেহুলাও তাহাতে চড়িয়া বসিল। সে স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া আনিবে, ইহাই তাহার একমাত্র সঙ্কল্প। বহু দুঃখ সহিয়া এবং প্রলোভন জয় করিয়া বেহুলা স্বর্গে গেল এবং মহাদেব ও অন্যান্য দেবতাকে নৃত্যগীতে মুগ্ধ করিয়া স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া পাইল। মনসার কঠোর মনও কোমল হইল। বেহুলা মৃত ভাশুরদেরও বাঁচাইয়া তুলিল এবং শ্বশুরের নিমজ্জিত বাণিজ্যতরী উদ্ধার করিয়া মহাসমারোহে শ্বশুর বাড়ী ফিরিল। সে মনসার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, চাঁদ সদাগরকে দিয়া মনসার পূজা করাইয়া লইবে। চাঁদ সদাগর মনসার রক্তচক্ষু অবহেলা করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রবধূ বেহুলার অনুরোধ ঠেলিতে পারিলেন না, বাম হস্তে মনসার উদ্দেশে ফুল দিলেন। কারণ দক্ষিণ হাতে তিনি শিবপূজা করেন, সেই

হাতে কি করিয়া স্ত্রী-দেবতার পূজা করিবেন? প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চাঁদ সদাগরের মত বীর্যবান পুরুষ চরিত্র এবং বেহুলার মত সতীসাধ্বী স্ত্রী-চরিত্র অতি অল্পই পাওয়া যায়।

মনসামঙ্গলের কবি ॥

কানা হরিদত্ত নামক কোন এক কবি বোধহয় সর্বপ্রথম মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কাব্য পাওয়া যায় নাই, হরিদত্তের বিশেষ কোন পরিচয়ও জানা যায় না। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে মনসামঙ্গলের প্রধান কবিদের মধ্যে নারায়ণদেব, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস ও জীবন মৈত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কবি নারায়ণদেব পূর্ববঙ্গে মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত বোর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি বোধহয় পূর্বে রাঢ় দেশে বাস করিতেন। তাঁহার উপাধি ছিল সুকবি-বল্লভ। তিনি ১৫শ শতাব্দীর কোন এক সময় বর্তমান ছিলেন। কবি নারায়ণদেব করুণরস ও হাস্যরস সৃষ্টিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

বিপ্রদাস পিপ্‌লাই ও বিজয়গুপ্ত—দুই জনেই প্রায় সমসাময়িক। ইঁহারা হোসেন শাহের আমলের গোড়ার দিকে ১৫শ শতাব্দীর শেষে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বিপ্রদাস পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং বিজয়গুপ্ত বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রামে আবির্ভূত হন। ইঁহারা দুই জনেই শক্তিশালী কবি; কিন্তু বিজয়গুপ্তের প্রচার অধিক হইয়াছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে কলিকাতার উল্লেখ আছে। কাব্যের স্বচ্ছ প্রবাহ, পরিহাস-রসিকতা প্রভৃতির জন্য বিজয়গুপ্তের কাব্য অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

দ্বিজ বংশীদাস মৈমনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। অনুমান তিনি ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন; তাঁহার কাব্যে সংস্কৃত-পুরাণের প্রভাব লক্ষণীয়। কবি কেতকাদাস-ক্ষমানন্দ পশ্চিমবঙ্গে আবির্ভূত

হইয়াছিলেন। 'কেতকাদাস' বোধহয় তাঁহার উপাধি। কারণ মনসার আর-এক নাম কেতকা। ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গল পশ্চিম-বঙ্গে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার কাব্য রচিত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও কবির পাণ্ডিত্য ও পুরাণজ্ঞান প্রশংসনীয়; কবি জীবন মৈত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে মনসামঙ্গল রচনা করেন। যদিও এই কাব্যে বিশেষ কবিত্ব নাই, তবু পশ্চিম-বঙ্গে ইহার বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, বংশীদাস ও ক্ষমানন্দ অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন।

২। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী॥

যতদূর মনে হয় চণ্ডীমঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডিকাও অপৌরাণিক দেবতা। চণ্ডীকে পুরাণের সহিত মিলাইয়া দিবার জন্য পরবর্তিকালে তাহাকে পুরাণের দুর্গার সঙ্গে এক করিয়া মহাদেবের স্ত্রীরূপে প্রচার করা হয়। প্রথমে অরণ্যচারী ব্যাধজাতি তাঁহার উপাসনা করিত। তার পরে তিনি বণিকসমাজে প্রাধান্য বিস্তার করেন। মনসাদেবীর মত মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীও গ্রাম্য দেবী, কিন্তু যখন আর্য ও আর্যেতর ধর্মের সমন্বয় হইতেছিল, তখনই সম্ভবতঃ ব্যাধের দেবী চণ্ডী বণিকসমাজের দেবী বলিয়া গৃহীতা হন। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যাপার বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে, চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুই অংশে বিভক্ত—ব্যাধের কাহিনী ও বণিকের কাহিনী। প্রথম খণ্ডে কালকেতু ব্যাধের প্রতি দেবীর করুণা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী বণিক ধনপতি সদাগর এবং তাঁহার

পুত্র শ্রীমন্ত সদাগরের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে চণ্ডী পশুর রক্ষয়িত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র কালকেতু ব্যাধ স্ত্রী ফুল্লরাকে লইয়া সুখে বাস করিত, মৃগয়ার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। কালকেতুর বীরত্বে বনের হিংস্র পশুরা ভীত হইয়া চণ্ডীর কাছে গিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। এদিকে দেবী দেখিলেন যে, এই নির্লোভ ব্যাধের সাহায্যে মর্ত্যে তাঁহার পূজা প্রচারলাভ করিবে। তিনি একদিন স্বর্ণ গোধিকার (গো-সাপ) রূপ ধারণ করিয়া কালকেতুর পথে পড়িয়া রহিলেন। কালকেতু এই অশুভ লক্ষণ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গো-সাপটিকে ধনুকে বাঁধিয়া বাড়ী আনিল। ইচ্ছা—পোড়াইয়া খাইবে। তারপর দেবী সুন্দরী নারীমূর্তি ধারণ কবিয়া ফুল্লরা ও কালকেতুকে নানাভাবে পরীক্ষা করিলেন এবং দরিদ্র ব্যাধের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া বর দিলেন। ব্যাধ কালকেতু দেবীর বরে রাজা হইল, বন কাটিয়া গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠা করিল, মহাসমারোহে দেবীর পূজা প্রচারিত হইল। কিন্তু ভাড়ুদত্ত নামক এক শঠপ্রকৃতির ব্যক্তি কালকেতুকে বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ করিয়া বিশ্বাস অর্জন করিল এবং সেই সুযোগে প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া কালকেতু তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। ভাঁড়ুদত্ত এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কালকেতুর বিরুদ্ধে কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করিল। কলিঙ্গের রাজা কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ চলিবার সময় ভাঁড়ুদত্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কালকেতুকে কলিঙ্গ রাজার নিকট ধরাইয়া দিল। কালকেতু কলিঙ্গ রাজার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। ভক্তের দুঃখে দেবী চণ্ডিকা কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে ভয়ানক ভৎর্সনা করিলেন। তখন কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে দেবীর ভক্ত ও রক্ষিত জানিয়া সসম্মানে মুক্তি দিলেন। দেবীর সেবক কালকেতু সুখে রাজত্ব করিয়া সস্ত্রীক স্বর্গে গেল। ইহাই কালকেতুর উপাখ্যান।

কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ড বণিকখণ্ড বা ধনপতির উপাখ্যান নামে পরিচিত। ব্যাধসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর চণ্ডীর বণিকসমাজে পূজা লাভের ইচ্ছা হইল, কারণ তখন সমাজে বণিকদের প্রাধান্য। উজানী নগরের ধনপতি সদাগরের দুই স্ত্রী—লহনা ও খুল্লনা। ধনপতির অনুপস্থিতির সুযোগে দুর্বলা নাম্নী এক দাসী দুই সতীনের মধ্যে কলহ বাধাইয়া দিল। লহনা খুল্লনাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়া বনে বনে ছাগল চরাইবার কাজে নিযুক্ত করিল। খুল্লনা অতি দুঃখে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিয়া একটি হারানো ছাগল খুঁজিয়া পাইল। দেবী তাহার সাহায্যে বণিকসমাজে নিজের পূজা প্রচার করিতে চাহিলেন। ধনপতি বাড়ী ফিরিলে খুল্লনার দুঃখের দিন শেষ হইল। রাজার আদেশে বণিক ধনপতি আবার সিংহল যাত্রা করিলেন। পথে তিনি কালীদহে এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, সমুদ্রের মধ্যে কমলবনে পদ্মের উপর এক সুন্দরী রমণী বসিয়া একটি হাতী গিলিতেছেন এবং উগরাইয়া দিতেছেন। ইহাই 'কমলে-কামিনী'। ধনপতি সিংহলে গিয়া রাজার কাছে এই অদ্ভুত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। রাজা প্রথমে বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। ইহাতে ধনপতির রোখ চাপিয়া গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, রাজাকে এই দৃশ্য দেখাইতে না পারিলে সারাজীবন কারারুদ্ধ হইয়া থাকিবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি রাজাকে সেই 'কমলে-কামিনী' দেখাইতে পারিলেন না। ফলে তাঁহার বাণিজ্যতরী বাজেয়াপ্ত হইল। অতি দুঃখে কারাগারে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত বড় হইয়াছে। সে খুল্লনার নিকট কোনও প্রকারে অনুমতি আদায় করিয়া পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করিল। তাহারও ধনপতির দশা হইল। সেও রাজার কাছে সদম্ভে 'কমলে-কামিনী'র কথা বর্ণনা করিল এবং রাজাকে তাহা দেখাইতে পারিল না। মিথ্যাবাদীকে রাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। তাহার পরে অবশ্য দেবী পিতাপুত্রের প্রাণরক্ষা করিলেন, সিংহলরাজকেও যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত করিলেন।

তখন রাজার চৈতন্য হইল ; তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া কন্যা সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ দিলেন। ধনপতি মহাসমারোহে পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দেশে ফিরিলেন। তিনি বাণিজ্যে আসিবার সময় খুল্লনার চণ্ডীর ঘট সক্রোধে পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই এই বিড়ম্বনা। ইহাই চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনী। প্রায় সমস্ত কাব্যে এই দুইটি কাহিনী একসঙ্গে স্থান পাইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলের কবি ॥

চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবির নাম মাণিকদত্ত। ইনি সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; কারণ তাঁহার কাব্যে চৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুচরদের বর্ণনা আছে। চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় কবি চট্টগ্রামের দ্বিজমাধব ১৫৭৯ খ্রীঃ অব্দে কাব্য রচনা করেন। তাঁহার কাব্য 'সারদামঙ্গল' নামে অভিহিত। এই কাব্য মাণিকদত্তের অপেক্ষা পূর্ণতর, অবশ্য ইহাতে কবিত্বশক্তির বিশেষ কোন পরিচয় নাই। বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামনিবাসী মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি। উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির জন্য তিনি 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে মানসিংহের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় যে, ১৬শ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগে এই কাব্য রচিত হয়। ইহার প্রথম দিকে তাঁহার নিজের জীবনের দুঃখকথা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বর্ধমানের এক রাজকর্মচারীর দ্বারা অত্যাচারিত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদিসহ মেদিনীপুরে উপস্থিত হন এবং এখানকার ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর আনুকূল্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (অভয়ামঙ্গল) রচনা করেন। শুধু প্রাচীন কালে নহে, একালের সাহিত্যেও মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যে যে প্রসন্ন জীবনরস ও বেদনার বাস্তব চিত্র আছে তাহার মূল্য অসাধারণ।

সম্প্রতি ডঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস মহাশয় চট্টগ্রাম হইতে দ্বিজরামদেব নামক একজন নূতন কবির অভয়ামঙ্গল কাব্য উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। ইতিপূর্বে আমরা এই কবির কোন পরিচয় জানিতাম না। ইনি সম্ভবতঃ মুকুন্দরামের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবিত্ব-শক্তিতে দ্বিজ রামদেব মুকুন্দরামের সমকক্ষ না হইলেও বিশেষ প্রশংসা দাবী করিতে পারেন। চণ্ডীমঙ্গলের আরও অনেক কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমরা এই শ্রেণীর কাব্যের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গলের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শেষ ক্ষমতাশালী কবি। তিনি ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পরে (১৭৬০ খ্রীঃ অঃ) লোকান্তরিত হন। তাঁহার অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, নানা ক্ষুদ্র কবিতা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসকে ছাড়িয়া দিলে ভারতচন্দ্রের মত শিল্পপ্রতিভা মধ্যযুগের কোন কবির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। অন্নদামঙ্গলে দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। চরিত্রসৃষ্টিতে মুকুন্দরামের মত সফল না হইলেও ভারতচন্দ্র কবিতার কলারূপ ও কল্পনা-কুশলতায় মধ্যযুগীয় সকল কবিদের ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

৩। ধর্মমঙ্গলকাব্য

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যকে কেহ কেহ রাঢ়ের 'জাতীয় মহাকাব্য' বা National Epic বলিয়া থাকেন। কারণ ইহাতে পালযুগের রাঢ় দেশের যুদ্ধবিগ্রহাদি বাণত হইয়াছে। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের দুই জন দেবতাই শক্তি অর্থাৎ স্ত্রী-দেবতা। কিন্তু ধমমঙ্গলের দেবতা পুরুষ,—তিনি ধর্মঠাকুর। কেহ বলেন যে, ইনি বৌদ্ধ দেবতা। ইনি যাহাই

হউন না কেন, বিষ্ণু প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার প্রভাবেই ইহার কলেবর গঠিত হইয়াছে।

কর্ণসেন ছিলেন গৌড়েশ্বরের এক প্রধান সামন্ত; তিনি ঢেকুরগড়ে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি বিনষ্ট হইলে গৌড়েশ্বর তাঁহার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দেন। রঞ্জাবতীর ভাই অর্থাৎ গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদ বা মাহুদ্যা এই বিবাহের ঘোরতর বিরুদ্ধে ছিল। তাহার অমতে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায় সে কর্ণসেনের শত্রুতা করিতে লাগিল। ধর্মঠাকুরের বরে এবং রঞ্জাবতীর সুকঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার ফলে কর্ণসেনের লাউসেন নামক এক পুত্র জন্মিল। এদিকে মাহুদ্যা ভাগিনা লাউসেনের প্রাণবিনাশের জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিল; কিন্তু ধর্মঠাকুরের বরে লাউসেনের প্রাণরক্ষা হইল। ক্রমে লাউসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, চারিদিকে তাহার বীরত্বের খ্যাতি প্রচারিত হইল। সে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া কলিঙ্গা ও কানাড়া নাম্নী দুই রাজকন্যাকে বিবাহ করিল। তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে মাহুদ্যা রাজধানী আক্রমণ করিয়াও ব্যর্থ হইল। তখন সে একটা বিষম চাল চালিল। সে বলিল—লাউসেনের যদি এতই ক্ষমতা, তাহা হইলে সে কেন পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাক না! গৌড়েশ্বর শ্যালকের কথায় ভুলিয়া লাউসেনকে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইতে আদেশ করিলেন। এমনই ধর্মঠাকুরের মহিমা যে, লাউসেন এই দুঃসাধ্য কার্যেও সফল হইল। চারিদিকে তাহার জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। অতঃপর সে নিশ্চিন্ত মনে নিজ রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিল। এই ধর্মমঙ্গলকাব্য মহাকাব্যের অনুরূপ বীররসাত্মক কাহিনীতে পরিপূর্ণ; অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত দেবতার পূজাপ্রচারই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে।

ধর্মমঙ্গলের কবি ॥

ধর্মমঙ্গলের আদি কবির নাম ময়ূরভট্ট এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় কবির নাম ঘনরাম চক্রবর্তী। নানা ধর্মমঙ্গল কাব্যে ময়ূরভট্টের উল্লেখ পাওয়া গেলেও

তাঁহার কোন প্রামাণিক কাব্য এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পরে রূপরাম, মাণিকরাম, সীতারাম, সহদেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা প্রায় একই ছাঁচে কাব্য লিখিয়াছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই ত্রুটিটি মারাত্মক। যাহা হউক ধর্মমঙ্গলে মহাকাব্যের মত বিশালতা ও বৈচিত্র্য আছে; কিন্তু বিশেষ কোথাও কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর নাই। কবিগণ কাব্যের প্রারম্ভে বিস্তারিতভাবে আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা একঘেয়ে হইলেও কৌতূহলপ্রদ। ছাপাখানার যুগে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল অধিকতর প্রচারলাভ করিয়াছে। তিনি ১৭১১ খ্রীঃ অব্দে এই কাব্য রচনা করেন। কাজেই তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবি বলা চলিতে পারে।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের কাব্যমূল্য যেরূপই হউক না কেন, ইহার মধ্যে সেই যুগের দেশ-সমাজ-লোকজীবন-ধর্ম-ঐতিহ্যের যে পরিচয় নিহিত আছে, তাহার বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে।

॥ অনুশীলন ॥

১। মঙ্গলকাব্য কাহাকে বলে? মঙ্গলকাব্যের নাম 'মঙ্গল'কাব্য হইল কেন?

২। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। মনসামঙ্গলের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবির পরিচয় দাও।

৪। মুকুন্দরামকে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় কেন? ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্য-সম্বন্ধে কি জান?

৫। ধর্মমঙ্গলকাব্যকে রাঢ়ের 'জাতীয় মহাকাব্য' বলা হয় কেন? ধর্মমঙ্গলের দুই জন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুবাদ-সাহিত্য : রামায়ণ ও মহাভারত

চৈতন্যদেবের পূর্ব হইতেই বাঙলাদেশে রামায়ণ ও মহাভারতের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারতে সমগ্র ভারতবর্ষের জীবন ও সাধনা বিধৃত হইয়াছে। মূল গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত বলিয়া জনসাধারণে ইহা বুঝিতে পারিত না। তখন সমাজের নেতৃস্থানীয়গণ কখনও পাঁচালীর আকারে লোকের বোধগম্য ভাষায় রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের কথা ব্যাখ্যা করিতেন, কখনও-বা কবিগণ প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ করিতেন। সারা ভারতবর্ষেই রামায়ণ ও মহাভারতের নানা অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৭শ শতাব্দীতে তুলসীদাস নামক এক ভক্তকবি হিন্দী ভাষায় 'রামচরিত মানস' নামক রামায়ণ রচনা করেন। ইহা 'তুলসীদাসী রামায়ণ' নামে দেশবিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। অবশ্য বাঙলাদেশে তুলসীদাসের পূর্বেই রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল।

অনুবাদ বলিতে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় রূপান্তর বুঝায়। ইহা অনেক রকম হইতে পারে। কেহ আক্ষরিক অনুবাদ করেন। হুবহু অনুবাদের নাম আক্ষরিক অনুবাদ। কেহ-বা ভাবানুবাদ করেন—অর্থাৎ এক ভাষায় রচিত গ্রন্থকে অন্য ভাষার আদর্শ অনুসারে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদে পদে পদে মূলকে অনুসরণ না করিয়া অনুবাদকের স্বাধীনতা অবলম্বনের অধিকার থাকে। কেহ-বা মূল ঘটনাকে নিজ ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত করেন। ইহাতে মূলের ভাষাভঙ্গী রক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। বাঙলাদেশে রামায়ণ-মহাভারতের যে অনুবাদ হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই

ভাবানুবাদ। কবিগণ কোনও কোনও স্থলে সংস্কৃত গ্রন্থকে অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাহিনীকে প্রায়ই নিজের মত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ-বা, মূল রামায়ণে নাই, এমন অনেক গল্প যোগ করিয়া দিয়াছেন।

বাঙলাদেশে বহুপূর্ব হইতে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণের প্রভাব ছিল। পাল রাজারা ধর্মমতে বৌদ্ধ হইলেও রামায়ণ-মহাভারকে শ্রদ্ধা করিতেন। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের আমলে যে রামায়ণ-মহাভারতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান আক্রমণ ও শাসনের ফলে হিন্দুর ধর্মকর্ম ও সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হইলে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। যাহাতে হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ রক্ষা পায় তাহার জন্য মধ্যযুগে বাঙলাদেশে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের অনুশীলন হইয়াছিল। অবশ্য মুসলমান সুলতানগণ হিন্দুর প্রতি যে পুরাপুরি বিরূপ ছিলেন তাহা নহে। তাঁহাদের অনেকেই এই অনুবাদকার্যে বাঙালী কবিকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এখানে আমরা আলোচনা সংক্ষেপ করিবার জন্য শুধু রামায়ণ-মহাভারতের কথা বলিব।

১। রামায়ণ

এক সময়ে বাল্মীকির রামায়ণের মূল কাহিনী কথকতা ও পাঁচালীর আকারে বাঙলাদেশে সুপ্রচলিত ছিল। কথকঠাকুর ও পাঁচালীগায়কগণ শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য মূল কাহিনীকে ইচ্ছামত বদলাইয়া লইতেন, কখনও-বা নূতন গল্প যোগ করিয়া দিতেন। ক্রমে কবিগণ আবির্ভূত হইলেন, অনুবাদ করিলেন,—কিন্তু পাঁচালীর প্রভাব এড়াইতে পারিলেন না। রামায়ণ তাই 'রামায়ণ পাঁচালী' নামে পরিচিত হইয়াছে।

কবি কৃত্তিবাস ওঝা রামায়ণের আদি অনুবাদক এবং প্রাচীন বাঙলার জনপ্রিয় কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এখনও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। বাঙলার আধুনিক কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার—প্রায় সকলেই কৃত্তিবাসের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। কৃত্তিবাস রাণাঘাটের নিকট ফুলিয়া গ্রামে ওঝা-উপাধিধারী (মুখোপাধ্যায়) ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল লইয়া নানা মতভেদ হইয়াছে। মনে হয় ১৪শ শতাব্দীর কোনও এক সময়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার লেখা আত্মজীবনীজ্ঞাপক পয়ারগুলি খুব যে প্রামাণিক তাহা মনে হয় না, অন্ততঃ ইহাতে অনেক ভেজাল ঢুকিয়াছে। তবু ইহা হইতে তাঁহার জীবনসম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ জানা যায়। কৃত্তিবাস উত্তর-বাঙলায় বিদ্যার্জন করিয়া গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হন। তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর পুরস্কার দিতে চাহিলে এই ব্রাহ্মণ-কবি রাজার দান সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত; বাল্মীকির অনুসরণ হইলেও ইহাতে অন্যান্য রামায়ণ ও সংস্কৃত গ্রন্থের প্রভাব আছে। কবি নিজেও অনেক নূতন কাহিনী যোগ করিয়াছেন। ইহাতে রামচন্দ্রের কর্তব্যকঠিন, ত্যাগপূত ও ভক্তিরসার্দ্র চরিত্রটি চমৎকার ফুটিয়াছে। সর্বংসহা সীতা দেবী একেবারে বাঙালী বধূটির মত স্নিগ্ধ ও মধুর হইয়াছেন। লক্ষ্মণ যেন বাঙলাদেশের আদর্শ দেবর; হনুমান আদর্শ সেবক, অনুচর ও ভক্ত। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু স্থলে বাঙলাদেশের প্রভাব পড়িয়াছে। করুণরস, বীররস ও কৌতুকরসে সিঞ্চিত এই মহাগ্রন্থ প্রাচীন ও আধুনিক বাঙালীর মনের আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ের পিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙলাদেশে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করিলেও আরও অনেক কবি রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ অথবা কিয়দংশ অনুবাদ করেন। তাঁহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ দাসের অদ্ভুতরামায়ণ এবং রঘুনন্দন গোস্বামীর রামরসায়ন উল্লেখযোগ্য। নিত্যানন্দের অপর নাম 'অদ্ভুত আচার্য'। তাঁহার

রামায়ণে সংস্কৃত অদ্ভুতরামায়ণের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে। সেই জন্যই বোধহয় তাঁহার গ্রন্থ 'অদ্ভুত রামায়ণ' নামে পরিচিত। ইনি ১৭শ শতাব্দীতে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার গ্রন্থে কৃত্তিবাসের কোনও কোনও রচনা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। কবিত্বশক্তিতে নিত্যানন্দ কৃত্তিবাসের সমকক্ষ নহেন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে রচিত বর্ধমান জেলানিবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রামরসায়ন' বাঙলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। তাঁহার কাব্যে কোমল ভক্তির দিকটি চমৎকার ফুটিয়াছে। ইঁহার ভাষা, ছন্দ ও শব্দযোজনার কৌশল এখনও প্রশংসা দাবী করিতে পারে। এই তিন জন প্রধান কবি ছাড়াও আরও অনেক অল্পপরিচিত কবি রামায়ণ অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাস ও রঘুনন্দনের যশে সকলেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।)

২। মহাভারত

(বাঙলাদেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত কাশীরাম দাসের মহাভারতও অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। মূল মহাভারতের কাহিনী বিরাট, ব্যাপক ও জটিল; তাহাতে এমন অনেক আখ্যান-উপাখ্যান, নীতিতত্ত্ব ও ধর্মকথা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার সম্যক্ পরিচয় লওয়াই দুরূহ। কাজেই যাঁহারা মহাভারত অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় কেহই মূলকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেন নাই।)

(মহাভারতের প্রচীন অনুবাদকের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর নাম উল্লেখ করা যায়।) সঞ্জয় সম্বন্ধে এখনও সংশয় কাটে নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খাঁ-এর আদেশে মহাভারত অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সহজ ভাষায় মূল মহাভারতকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। পরাগল খাঁ-এর নির্দেশে রচিত হয় বলিয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামেও পরিচিত। পরাগল খাঁ-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁ চট্টগ্রামের

শাসনকর্তা হন। শ্রীকর নন্দী তাঁহার নির্দেশে মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব অনুবাদ করেন। কাহারও কাহারও মতে পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তি। একথা কিন্তু ঠিক নহে। দুই জনের ভণিতাযুক্ত পুঁথিতে এমন পার্থক্য আছে যে, তাঁহাদিগকে পৃথক কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

(মহাভারতের শ্রেষ্ঠকবি কাশীরাম দাস, উপাধি—'দেব'। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে কায়স্থবংশে কাশীরামের জন্ম হয়। তাঁহার মহাভারত বোধহয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব ও বিরাটপর্বের কিয়দংশ সমাপ্ত করিয়া কাশীরাম স্বর্গারোহণ করেন। অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম। এ সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। কাশীরামের রচনা একটু সংস্কৃতগন্ধী, গুরুভার ও অলঙ্কারবহুল। ইহাতে কবির কৃষ্ণভক্তি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।) কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত বাঙলাদেশে যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, অন্য কোন কাব্যের সেরূপ সৌভাগ্য হয় নাই। কাশীরামের পরেও কেহ কেহ অনুবাদে দুঃসাহসিকতা দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু কাহারও কাব্য বিশেষ প্রচার লাভ করে নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত বাঙালীর জীবন ও সাধনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, পরিপোষণ করিয়াছে, রক্ষা করিয়াছে।

॥ অনুশীলন ॥

১। অনুবাদ-সাহিত্য কাহাকে বলে? সাধারণতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে কত-প্রকার অনুবাদ-রীতি ব্যবহৃত হয়? বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে কোন্ রীতিটি প্রাধান্য পাইয়াছে?

২। কৃত্তিবাসকে রামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কেন বলা হয়? তাঁহার রামায়ণে বাঙালী-মনোভাবের প্রভাব পড়িয়াছে, বলা হয় কেন? রঘুনন্দন গোস্বামীর রামায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

৩। কাশীরাম দাসের পূর্ববর্তী দুই জন মহাভারত-অনুবাদকের নাম উল্লেখ কর। কাশীরামের মহাভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি জান?

তৃতীয় অধ্যায়

চৈতন্যদেব ও চৈতন্যজীবনী

চৈতন্যযুগ ও বাঙলাদেশ

কোন কোন সময়ে কেবলমাত্র একজন প্রতিভাধর পুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া দেশের জীবনধারা, ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আমূল পরিবর্তিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে মধ্যযুগের বাঙলাদেশ, বাঙালীজাতি ও বঙ্গসংস্কৃতির সেইরূপ অভিনব পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল। সেইজন্য চৈতন্য-প্রভাবান্বিত মধ্যযুগের বাঙালীর সংস্কৃতিকে চৈতন্যযুগ নামে অভিহিত করা হয়। ইতিহাসে ইহা 'চৈতন্য-রেনেসাঁস' নামে পরিচিত—যাহার অর্থ চৈতন্য-প্রভাবে বাঙলার সংস্কৃতির নবরূপান্তর।

মধ্যযুগে মুসলমান-শাসনের ফলে বাঙালীর ধর্মকর্ম বহুল পরিমাণে বিপর্যস্ত হইয়াছিল; হিন্দুসমাজ আচার-বিচারের নাগপাশ ও শাস্ত্রসংহিতার মন্ত্রবচন কণ্ঠস্থ করিয়া ভক্তির পুণ্য ধারাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবেব ফলে বাঙালী আবার পুরাতন সংস্কৃতিকে নবরূপে গ্রহণ করিল। তর্কবিদ্যার বৃথা-পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রাচারের অর্থহীন আবৃত্তি এবং তন্ত্রমন্ত্রের গোপনীয় আচার-আচরণের স্থলে চৈতন্যপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রসারলাভ করিল। মানুষে মানুষে ভেদ নাই; অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম জাগিলেই মানুষ ধন্য কৃতার্থ—জাতিপাতির ভেদবিভেদ বিলাইয়া দিয়া চৈতন্যদেব এই নূতন প্রেমধর্ম প্রচার করিলেন। তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় এই প্রেমের বাণীকে দূর-দূরান্তরে লইয়া গেলেন। অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, রূপ-সনাতন-জীবগোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ প্রভৃতি চৈতন্যভক্ত এবং ভক্তিশাস্ত্রের

পণ্ডিতগণ মহাপ্রভুর এই প্রেমধর্মকে পবিত্র হোমাগ্নির মত রক্ষা করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের এই আদর্শ যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাকেই দিব্য চেতনা দান করিয়াছে। মদ্যপ, দুষ্ক্রিয়াসক্ত, পাষণ্ডও পরম ভক্ত হইয়াছে; দস্যু পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে; বিরাট ভূস্বামী কুবেরের ঐশ্বর্য বিলাইয়া দিয়া ছিন্ন কন্থা ধারণ করিয়াছেন। প্রেম, ভক্তি, কৃষ্ণনামে রুচি, শুদ্ধ যতি-জীবনের আদর্শ,—ইহাই মধ্যযুগের বাঙলাদেশকে অভিনব মানবতার পথে প্রেরণ করিয়াছে। একটি ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া জাতি ও জীবনের এমন অভিনব আলোড়ন, এবং প্রাণের এমন অনির্বাণ আলোক-পিপাসা পৃথিবীর ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না।

চৈতন্যদেবের জীবনকথা

চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি বাঙলাদেশ নহে, শ্রীহট্ট। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপধামে স্থায়িভাবে বসবাস করিতেন। জগন্নাথের দুইপুত্র—বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর। বিশ্বরূপ বাল্যবয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। জগন্নাথের দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বম্ভর ১৪৮৬ খ্রীঃ অব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বর্ণ ছিল তপ্ত কাঞ্চনের মত; তাই তাঁহাকে 'গৌরাঙ্গ' বা 'গোরা' বলা হইত। পিতামাতা ডাকিতেন 'নিমাই' বলিয়া। নবদ্বীপে চৈতন্যদেব নিমাইপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরপুরী নামক এক সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঈশ্বরপুরী তাঁহার নূতন নামকরণ করেন—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' সংক্ষেপে 'শ্রীচৈতন্য'। পরবর্তিকালে ভক্তগণ তাঁহাকে 'মহাপ্রভু' বলিতেন। বাঙলাদেশে নিমাই 'মহাপ্রভু' ও 'শ্রীচৈতন্যদেব' নামে অধিকতর পরিচিত।

চৈতন্যদেব বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। কিন্তু সকলে তাঁহার দুরন্তপনা সত্বেও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিত। যৌবনে তিনি মহাপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া

দেশ-দেশান্তর হইতে ছাত্রগণ তাঁহার টোলে ব্যাকরণ অলঙ্কার পড়িতে আসিত। তাঁহার অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। চৈতন্যের প্রথমা পত্নীর নাম লক্ষ্মী দেবী। নিমাই পণ্ডিত যখন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন সর্পদংশনে লক্ষ্মী দেবী প্রাণত্যাগ করেন। এই দুঃসংবাদে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পাইলেন। যাহা হউক মাতার অনুরোধে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। বিষ্ণুপ্রিয়া পরবর্তিকালে বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর গয়াধামে পিতৃপিণ্ড দিতে গিয়া নিমাইপণ্ডিতের অন্তরে অকস্মাৎ কৃষ্ণভক্তির আবির্ভাব হইল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ভক্ত ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। বিদ্যারসে-আকণ্ঠমগ্ন নিমাইপণ্ডিতের অহঙ্কারদর্প সব নষ্ট হইল। তিনি কৃষ্ণবিরহে দিবারাত্র রোদন করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে ফিরিয়াও সংসারে তাঁহার মন টিকিল না। কৃষ্ণপ্রেম তাঁহার অন্তরকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। সেখানে বিষয়-বাসনা কেমন করিয়া থাকিবে ?

তখন নবদ্বীপে বড় দুর্যোগ। শুধু নবদ্বীপ কেন, সমস্ত বাঙলাদেশেই হিন্দুর ধর্মকর্ম ও শাস্ত্রাচারের অত্যধিক আধিপত্যে প্রেম ও ভক্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। সমাজে, জাতিতে, শ্রেণীতে ভয়াবহ অন্তর্বিরোধ। চৈতন্যদেব এ-হেন বাঙলাদেশে প্রেমের অমৃত বাণী প্রচার করিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সকলের মনে চৈতন্যের প্রেমধর্ম স্থান পাইল। নবদ্বীপ হরিসঙ্কীর্তনে মুখরিত হইল। চব্বিশ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব মাতার অনুমতি লইয়া এবং স্ত্রীকে বুঝাইয়া সন্ন্যাস লইলেন, পরে কিছুকাল পুরীধামে কাটাইয়া ভারত ভ্রমণে বাহির হইলেন। তিনি দক্ষিণ-ভারত, গুজরাট, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করিরা বৃহদ্ ভারতবর্ষের পরিচয় পাইলেন। এইরূপে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। তিনি যেখানে গিয়াছেন সেখানে জাতি-

ধর্মনির্বিশেষে সকলেই তাঁহার ভক্ত হইয়াছে। জীবনের শেষ আঠারো বৎসর তিনি পুরীধামে অতিবাহিত করেন। ১৫৩৪ খ্রীঃ অব্দের আষাঢ় মাসে তাঁহার তিরোধান হয়।

চৈতন্যদেব মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে বাঙলাদেশকে তিনি কয়েক শতাব্দী আগাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের পর বৃন্দাবনের শিষ্যসম্প্রদায়ের সাহায্যে সারা ভারতেই প্রেমাশ্রিত বৈষ্ণবধর্ম প্রচার লাভ করে। মহাপ্রভু যদিও বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তাঁহার অনুচর ও শিষ্যসম্প্রদায় তাঁহার জীবন, ধর্ম, দর্শন ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সংস্কৃত ও বাংলায় অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে চৈতন্যজীবনীগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্যজীবনী

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনীগুলির বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে এই প্রকার জীবনী রচিত হয় নাই। দেবতা বা দেবতার অবতার সম্বন্ধে ভারতীয় মনের কৌতূহল ছিল। চৈতন্যদেবের পূত জীবনকথা মর্ত্যের ব্যাপার হইলেও তাহাতে স্বর্গীয় জ্যোতি বিকশিত হইয়াছে। সর্বোপরি চৈতন্যদেব তো শুধু জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান নহেন, তিনি অবতারকল্প মহাপুরুষ। অতএব তাঁহার জীবন যে সাহিত্যের উপাদান হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র পূর্ব-ভারতে ভাবের যে বন্যা বহিয়াছিল, তাঁহার জীবনী-বিষয়ক পদাবলী ও গ্রন্থে তাহার সুচারু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পাশ্চাত্ত্য জীবনীগ্রন্থের (Biography) আদর্শে চৈতন্যজীবনীগুলিকে হয়ত যথার্থ জীবনী বলিতে পারা যায় না। জীবনীতে বাস্তব জীবনের ঘটনার যথাযথ বিবরণ থাকা প্রয়োজন; কিন্তু চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থে বাস্তব-জীবন অপেক্ষা অধ্যাত্মজীবন অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। তাহা হইলেও এই গ্রন্থসমূহ হইতে চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত জীবন ও তৎকালীন দেশ ও

সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগে চৈতন্যজীবনকে কেন্দ্র করিয় নিম্নলিখিত জীবনীগুলি রচিত হইয়াছিল :—গোবিন্দদাসের কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত। বাসুদেব ঘোষ নামক এক পদকর্তা সুন্দর সুন্দর পদে চৈতন্যজীবনের কিছু কিছু কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন।

১॥ **গোবিন্দদাসের কড়চা**—বর্ধমানের কাঞ্চননগর-নিবাসী গোবিন্দদাস কর্মকার নামক এক ব্যক্তি চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাস ভ্রমণের 'নোট' লিখিয়া রাখিতেন। ইহাই 'গোবিন্দদাসের কড়চা'। প্রাচীন বাংলাভাষায় নোট বা ডায়েরিকে 'কড়চা' বলিত। ইহাতে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণবিষয়ে অনেক অভিনব কথা আছে। এই কড়চার ভাষা ও ছন্দ অতিশয় মার্জিত ও আধুনিক। সেই জন্য অনেকেই ইহাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবসমাজেও গোবিন্দদাসের কড়চা আদৌ পরিচিত নহে। কাহারও মতে ইহা সম্পূর্ণ জাল; কেহ বলেন যে, ইহার ভাষায় অত্যন্ত আধুনিক হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। সে যাহা হউক, ভাব, ভাষা ও তথ্যাদি বিচার করিলে ইহাকে প্রামাণিক চৈতন্যজীবনী বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

২॥ **জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল**—জয়ানন্দ মান্দারণের নিকট আমাইপুরা গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মনে হয় কাব্যটি ১৬শ শতকের শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। কাব্যগুণবর্জিত এই চৈতন্যজীবনী পাঁচালীর ঢঙে রচিত। বোধহয় জয়ানন্দ জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। কাব্য হিসাবে ইহার বিশেষ খ্যাতি না থাকিলেও জয়ানন্দ ইহাতে কয়েকটি অভিনব ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন, এবং তিনি পুরীধামে পায়ে ইষ্টকবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন—জয়ানন্দের এই মন্তব্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে।

৩ ॥ **বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত**—চৈতন্যভাগবত প্রামাণিক চৈতন্যজীবনী হিসাবে বাঙলার বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে চৈতন্যভাগবত 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে অভিহিত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস ১৬শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবির্ভূত হন এবং বর্ধমানের দেনুর গ্রামে বসবাস করেন। নিত্যানন্দপ্রভুকে তিনি গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। ১৬শ শতকের শেষভাগে বৃন্দাবনদাস লোকান্তরিত হন। আদি-মধ্য-অন্ত্য খণ্ডে সমাপ্ত এই বিরাট গ্রন্থে চৈতন্যের বাস্তবজীবন ও অলৌকিক কাহিনী - উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য এই গ্রন্থটি এখনও জনপ্রিয়তা রক্ষা করিয়াছে।

৪ ॥ **লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল**—লোচনের এই গ্রন্থ বোধ হয় বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্যভাগবতের পর রচিত হয়। ইহা প্রধানতঃ গান করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল। ইহার রচনাক্রম অনেকটা মঙ্গল কাব্যের অনুরূপ। লোচনদাস মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত গ্রন্থের আদর্শে ও প্রভাবে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। জীবনী হিসাবে ইহা বিশেষ প্রামাণিক না হইলেও ইহাতে লোচনের কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। গানের জন্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার ভাষা ও ছন্দ বৃন্দাবনদাস অপেক্ষা সুললিত ও সঙ্গীতধর্মী। লোচনদাস অনেকগুলি বৈষ্ণবপদেও কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

৫ ॥ **কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত**—এইবার আমরা চৈতন্য-জীবনবিষয়ক সবশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুধু চৈতন্যজীবনী হিসাবেই নহে, মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যেরও একখানি অমূল্য সম্পদ। অন্যান্য চৈতন্যজীবনীতে মহাপ্রভুর জীবনের শেষভাগের কাহিনী নামমাত্র বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস সেই অভাব মোচন করিবার জন্য অসুস্থ শরীরে অতি বৃদ্ধাবস্থায় এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন। মনে হয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে

ইহার রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কাটোয়ার নিকট ঝামটপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এই চিরকুমার কবি ও দার্শনিক নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শেষ-জীবন ব্রজমণ্ডলেই অতিবাহিত করেন। তিনি রূপ ও সনাতনের অনুগ্রহে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র, ভক্তিদর্শন ও চৈতন্য-জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার এই বিরাট গ্রন্থে চৈতন্যদেবের প্রথমদিকের জীবনকথা সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ তাঁহার পূর্বে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। ভারতীয় দর্শন পুরাণ স্মৃতিসংহিতা প্রভৃতিতে কৃষ্ণদাসের অসাধারণ অধিকার ছিল। চৈতন্যচরিতামৃত সেই পাণ্ডিত্য, দার্শনিকতা ও ভক্তিবাদের অম্লান স্বাক্ষর বহন করিতেছে। আধুনিক যুগে আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক কিছু করিয়াছি, কিন্তু প্রজ্ঞা ও প্রতিভায় এখনও কবিরাজ-গোস্বামীকে ছাড়াইতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। কৃষ্ণদাসের ভাষা সর্বত্র সুললিত নহে, কোথাও কোথাও ছন্দের ত্রুটীও আছে। দুরূহ দার্শনিক ব্যাপার গদ্যে ব্যাখ্যা করাই দুঃসাধ্য। কৃষ্ণদাস পয়ারত্রিপদী ছন্দে সেই দুঃসাধ্য সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। সুতরাং দুই এক স্থলে রচনা-পারিপাট্যের অভাব দেখা গেলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। সে যাহা হউক, চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত সর্বশ্রেষ্ঠ; সমগ্র বাঙলা সাহিত্যেও এইরূপ যুগান্তকারী গ্রন্থ বড় বেশী রচিত হয় নাই।

॥ অনুশীলন ॥

১। বাঙলাদেশে চৈতন্যদেবের প্রভাব নির্ণয় কর। বাংলা সাহিত্যের কোন একটি পর্বকে 'চৈতন্যযুগ' বলা হয় কেন? কোন্ কোন্ চৈতন্য-শিষ্যের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল?

অনুশীলন

২। চৈতন্য-জীবনীর প্রধান ঘটনা বিবৃত কর। নিমাইপণ্ডিত কেমন করিয়া চৈতন্যদেব হইলেন ?

৩। চৈতন্যজীবনীগুলিকে যথার্থ জীবনী বলা যায় কি ? বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে কি জান ?

৪। চৈতন্যজীবনীগুলির মধ্যে কোন্‌খানি সর্বশ্রেষ্ঠ ? সেই জীবনী ও জীবনীকারের পরিচয় দাও।

৫। 'গোবিন্দদাসের কড়চা'কে কেহ কেহ প্রামাণিক বলিতে সম্মত নহেন। ইহার কারণ কি ?

৬। জয়ানন্দ ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের তুলনামূলক আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দুই শাখা—একটি কাহিনীকেন্দ্রিক, আর একটি গীতিমূলক। কাহিনীগুলি পাঁচালীর আকারে পঠিত হইত, আবৃত্তি করা হইত; ইহাতে কদাচিৎ সঙ্গীত সংযোজিত হইত। মঙ্গলকাব্য রামায়ণ-মহাভারত, চৈতন্যজীবনী—সবই প্রায় এই শাখাভুক্ত। অপর শাখা মূলতঃ সঙ্গীতাশ্রয়ী। নানাবিধ পদে সুর সংযোজনা করিয়া গান করিবার উদ্দেশ্যেই এই জাতীয় কবিতা রচিত হইয়াছিল। সাধারণ কথায় ইহাকে পদ বলা হইত। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় নিজ নিজ দেবতার লীলা গান করিতেন এবং ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত কবিগণ পদ লিখিতেন। এইরূপে চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদ শাক্তপদ, বাউল গান প্রভৃতির জন্ম হইয়াছে।

বাঙলার পদাবলীসাহিত্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত: বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবলী। আদি যুগে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণও অনেক গান লিখিয়াছিলেন। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক বৌদ্ধ সহজিয়া সঙ্কলনে এইরূপ অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে।* চৈতন্য-তিরোধানের পর বাউল গানও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বাউলগানের কবিত্ব ও ভাবের গভীরতায় সবিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এখানে আমরা বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

১। বৈষ্ণবপদাবলী

বৈষ্ণবপদাবলী পরিচয়

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' যাহাকে 'পদং' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা গান ছাড়া আর কিছু নহে। বস্তুতঃ জয়দেব আদি বৈষ্ণবপদাবলীকার

* ভূমিকাতে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পৃঃ ৫-৬ দ্রষ্টব্য।

—যদিও তিনি সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-পদাবলীর কবিগণ জয়দেবকে আদিগুরু বলিয়া বরণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবপদাবলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। শুধু মধ্যযুগ নহে, আধুনিক কালের রসিক পাঠকও বৈষ্ণবপদাবলীর সূক্ষ্ম স্বরমূর্চ্ছনা, ভাবগভীরতা এবং ছন্দকলার উৎকর্ষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিকপালগণ বৈষ্ণব-পদরসে অভিষিঞ্চিত হইয়া তদনুরূপ পদ লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মধুস্দনের 'ব্রজাঙ্গনা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শেই রচিত—যদিও ইঁহাদের কবিতা এবং বৈষ্ণবপদালীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে।

বৈষ্ণবপদাবলীর কবিগণকে 'মহাজন' এবং তাঁহাদের পদসমূহকে 'মহাজন-পদাবলী' বলে। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অসংখ্য বৈষ্ণবকবি পদ রচনা করিয়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তুচ্ছতার অগৌরব হইতে রক্ষা করিয়াছেন। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমূদ্র', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্কলনগ্রন্থে বহু বৈষ্ণবপদ সংগৃহীত হইয়াছে।

বৈষ্ণপদাবলীর কোন কোন কবি 'ব্রজবুলি' নামক একটি কৃত্রিম কবি-ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। মৈথিলীকবি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ পদাবলী মৈথিলী ভাষায় রচিত। তাহাতে কিছু কিছু বাংলা শব্দ মিশিয়া গিয়া এই নূতন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে মনে করিত, এই ব্রজবুলি ব্রজমণ্ডল অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভাষা এবং এই ভাষায় বুঝি রাধাকৃষ্ণ কথা বলিতেন। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। মথুরা-বৃন্দাবনের বর্তমান ভাষার নাম 'ব্রজ ভাখা'; তাহার সহিত ব্রজবুলির বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। বিদ্যাপতির অনুসরণে বাঙালী কবির রচিত ব্রজবুলি-পদের মাধুর্য ও কাব্যগুণ বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে ব্রজবুলি ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছেন।

বৈষ্ণবপদাবলীর দুইটি পর্য্যায়—একটির নাম 'গৌরচন্দ্রিকা', অপরটি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদ। গৌরচন্দ্রিকা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রবেশক বা সূচনা। পদাবলী-কীর্তনের পূর্বে গৌরাঙ্গ-লীলা-বিষয়ক গান গাহিবার রীতি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবসমাজে প্রাধান্য অর্জন করে। ইহাকেই গৌরচন্দ্রিকা বলে। পূর্বরাগ, অনুরাগ, প্রথমমিলন, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, মাথুর, ভাবসম্মেলন প্রভৃতি নানা পর্যায় বা ঘটনার মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন কবি বিচ্ছিন্নাকারে পদ রচনা করিলেও ইহাদের মধ্যে ঘটনাগত সূক্ষ্ম সম্পর্ক বর্তমান। রাধাকৃষ্ণলীলা বাস্তব প্রেমের চিত্র নহে; বৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; রাধা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। উভয়ের মিলন-বিরহের লীলাই বৈষ্ণবপদের একমাত্র উপজীব্য। ভক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, বৈষ্ণবপদের কাব্যমূল্য অসাধারণ। ইহার কল্পনায় যে সূক্ষ্ম আলঙ্কারিক কারুকর্ম আছে, তাহা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বৈষ্ণব কবিগণ যেমন ভক্ত ছিলেন, তেমনি আবার কাব্যকলা সম্পর্কেও অতিশয় সতর্ক ছিলেন। ভাষার নিপুণতা, ধ্বনিঝঙ্কার, ছন্দের দোলা এবং রূপকল্পের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির সঙ্গে তুলনীয়।

বৈষ্ণবপদাবলীর কবি

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণবপদাবলীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—প্রাক্‌চৈতন্য (পূর্বচৈতন্য) পর্ব ও উত্তরচৈতন্য (চৈতন্য-পরবর্তী) পর্ব। চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি, জয়দেব চণ্ডীদাস, রায় রামানন্দ, প্রভৃতি ভক্তকবির কাব্যনাটক আস্বাদন করিতেন। বিদ্যাপতির পদাবলী তাঁহাকে বিশেষ আনন্দ দিত। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি বাঙালী না হইয়াও বাঙালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, বিদ্যাপতি বাঙালী কবি নহেন, সুতরাং তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রহণ করা উচিত হইবে না। এই মত যথার্থ নহে। কারণ বিদ্যাপতি

যেভাবে বাঙলাদেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বাংলা সাহিত্য হইতে বাদ দেওয়া সম্ভব নহে। জয়দেব সংস্কৃতে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তবু বাংলা সাহিত্যে তাঁহার যথাযোগ্য মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে; কারণ বৈষ্ণব সাহিত্য জয়দেবের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ঠিক তেমনি বিদ্যাপতির পদও বাঙালীর চিন্তা ও সংস্কারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাই বাঙলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির মর্যাদা অবারিত।

চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদও সানন্দে পাঠ করিতেন। এই কবি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র* কবি বড়ু চণ্ডীদাস, না অপর কোন চণ্ডীদাস, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। এই বিষয়ে এখনও কোন সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় নাই, মতভেদেরও অন্ত নাই। অনুমান যে, শ্রীচৈতন্যের সময়ে বা অল্প পরে বীরভূমের নান্নুর গ্রামের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাকে কেহ দীন চণ্ডীদাস, কেহ দ্বিজ চণ্ডীদাস, কেহ-বা শুধু চণ্ডীদাস বলিতে চাহেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। শোনা যায়, এই ব্রাহ্মণ-কবি রামী বা রামমণি নামক এক রজক কন্যাকে সাধনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের বহু পদে রামীর উল্লেখ আছে। এ সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের পদ বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী। কালে হয়ত সকলে বিদ্যাপতিকেও ভুলিয়া যাইবে; কিন্তু চণ্ডীদাসের সরল সহজ প্রাণের গভীর আনন্দ-বেদনার কথা চিরদিন স্মরণে থাকিবে।

গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর প্রভৃতি চৈতন্যোত্তর যুগের প্রসিদ্ধ পদকর্তাগণ বাংলা ও ব্রজবুলিতে এত অসংখ্য উৎকৃষ্ট পদ লিখিয়াছেন যে, বিশ্বের যে-কোন সাহিত্য তাহা লইয়া গর্ব করিতে পারে। ইঁহাদের

* ভূমিকায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে প্রতিভাবিচারে গোবিন্দদাস কবিরাজ সর্বশ্রেষ্ঠ। পদের মাধুর্য্য, ধ্বনিঝঙ্কার, ছন্দ ও শব্দচয়নের উৎকর্ষ বিচার করিলে তাঁহাকে বিদ্যাপতির সমকক্ষ মনে হইবে। তিনি বিদ্যাপতির আদর্শ অনুসরণ করিয়া প্রায় সমস্ত পদ ব্রজবুলিতে রচনা করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস-ভণিতাযুক্ত বাংলা পদগুলি সম্ভবতঃ অপর কোন গোবিন্দদাসের রচনা। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে গোবিন্দদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যামদাস কবিরাজও বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। জ্ঞানদাস পদাবলীর চণ্ডীদাসের প্রভাবে সরস ও সহজ বাংলা পদ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পদের অকৃত্রিম অনুভূতি ও নিরলঙ্কার ঐশ্বর্য বারবার চণ্ডীদাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের ভাব ও ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলিয়া অনেক সময় একের পদ অন্যের নামে চলিয়া গিয়াছে। বর্ধমানের দোগাছিয়া গ্রামে আবির্ভূত বলরামদাস বাৎসল্যরসের অনেক উৎকৃষ্ট পদ লিখিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলেরই আবির্ভাবকাল ১৬শ শতাব্দী; ১৭শ শতাব্দীতেও অনেক পদকর্তা পদ রচনা করিয়াছিলেন। ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদে নানারূপ চমৎকৃতি ও কারুকলার প্রভাব বৃদ্ধি পাইলেও, ১৬শ শতাব্দীর বৈষ্ণবপদের সে মাধুর্য, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক ভক্তি পদাবলীসাহিত্য হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইয়া গেল।

২। শাক্তপদাবলী

শাক্তপদাবলী পরিচয়

বাঙলাদেশ তন্ত্র ও শক্তিসাধনার কেন্দ্র। সৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণাকে তন্ত্রে আদ্যাশক্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি চণ্ডিকা, শিবের গৃহিণী,

উমা-পার্বতী। বাঙলাদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে চণ্ডী ও কালিকাকে অবলম্বন করিয়া তন্ত্রসাধনা প্রচলিত ছিল। বাংলা মঙ্গলকাব্যেও এই শক্তি দেবীদের প্রভাব। এদেশের শক্তসাহিত্য দুই শাখায় বিভক্ত: একটি মঙ্গলকাব্য আর একটি শাক্তপদাবলী। মঙ্গলকাব্য আখ্যানমূলক; সেখানে দেবী নিজ পূজা প্রচারের জন্য যে-কোন অন্যায় কাজ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; তিনি অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে যৎপরোনাস্তি পীড়িত করিয়া বলপূর্বক পূজা আদায় করিয়াছেন। অপরদিকে ১৮শ শতাব্দীতে শক্তি অর্থাৎ কালিকা ও দুর্গাকে অবলম্বন করিয়া যে শাক্তপদসমূহ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে ভক্তের আর্ত হৃদয় মাতৃমূর্তিকে প্রাণের ভক্তি নিবেদন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছে। তাই শাক্তপদাবলীতে বাৎসল্য রসেরই প্রাধান্য। বিরাট আদ্যাশক্তিকে সীমাবদ্ধ বাঙালীমাতার স্নেহাঞ্চলে বন্দী করিয়া শাক্তপদাবলীর কবিগণ একটা নূতন রস সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেক কালীভক্ত সাধককবি বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণলীলার আদর্শে শাক্তপদের পর্যায় সাজাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিরা শক্তিতন্ত্র ও শাক্তমতের বিরোধী হইলেও শাক্ত কবিদের মধ্যে বৈষ্ণবদের মত বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করা যায় না। তাঁহারা কালী ও কৃষ্ণকে অভেদ মনে করিতেন।

বাঙলার শাক্তপদাবলী বৈষ্ণবপদাবলীর মত উৎকৃষ্ট কাব্যধর্ম লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই পদগুলির মধ্যে বাঙলাদেশের মাতৃমূর্তি, স্নেহব্যাকুল মাতা-কন্যার সম্পর্ক এবং ভক্ত ও আদ্যাশক্তির বাৎসল্য-রসসিক্ত করুণ কোমল লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষ্ণবপদাবলীর রাধা চরিত্র অশেষ বৈচিত্র্যমণ্ডিত এবং রোমান্টিক সৌন্দর্যে অভিষিক্ত। শাক্ত পদাবলীতেও নারীচরিত্রের প্রাধান্য। তিনি সর্বশক্তিময়ী আদ্যাশক্তি হইলেও এই পদসমূহে ভক্তের ব্যাকুলতা, মাতার প্রতি অসহায় সন্তানের আবেগ প্রভৃতি গার্হস্থ্য রসই প্রাধান্য পাইয়াছে। বৈষ্ণবের রাধা রোমান্টিক নায়িকা, শাক্ত ভক্তের আদ্যাশক্তি ঘরের মা ও মেয়ে। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে মূল ভিত্তি

আদিরস। শাক্তপদাবলীর প্রধান সম্পদ বাৎসল্যরস। তাই বৈষ্ণব-পদাবলীর বিকৃতি হইলেও পবিত্রতা এবং স্নেহমুগ্ধ গার্হস্থ্য ভাব শাক্ত-পদাবলীকে অনুরূপ অবনতির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

শাক্তপদাবলীর কবি॥

বৈষ্ণব কবিগণ যেমন সংখ্যায় সুপ্রচুর, শাক্ত কবিগণের সংখ্যা ততটা নহে বৈষ্ণবপদাবলী অপেক্ষা শাক্তপদাবলী অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেরও বটে শ্রেষ্ঠ শাক্তপদকারগণ সকলেই ১৮শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ভক্ত ও সাধককবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন এবং সাধকপ্রবর কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের শ্যামাসঙ্গীতগুলির অকৃপণ ভক্তিরস এবং আদ্যাশক্তির নিকা সন্তানের আত্মসমর্পণের চিত্রটি মানবিক মহিমা লাভ করিয়াছে। এই জন্য কাব্যাংশে এগুলি তত উৎকৃষ্ট না হইলেও অবারিত প্রাণের সহজ ভক্তিবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে বলিয়া ইহাতে যেমন অপার্থিব শুচিতা আছে তেমনি আছে মাটির মায়ের স্নিগ্ধ অন্নব্যঞ্জনের অমৃত-আস্বাদন।

হালি শহরের অন্তঃপাতি কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যবংশে ১৭শ শতাব্দী শেষভাগে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িব এবং বোধ হয় রায়গুণাকর অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ। তিনি শাক্তপদাবলী ছাড়াও 'বিদ্যাসুন্দর' নামক একখানি রোমান্টিক প্রেমের কাব্য এব বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে 'কালীকীর্তন' রচনা করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগ জীবনে রামপ্রসাদ মহাকালীর পরমভক্ত এবং তন্ত্রসাধক ছিলেন; তাঁহা অনেক পদে তন্ত্রসাধনার নানা ইঙ্গিত আছে। অবশ্য তাঁহার খ্যাতি কালজয় হইয়াছে শাক্তপদের জন্য। তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' অপেক্ষা নিকৃষ্ট; কালীকীর্তনের পরিকল্পনা অভিনব, কিন্তু সাহিত্য হিসা তাহার মূল্য বেশী নহে। তাঁহার শাক্তপদাবলীর মধ্যে অন্তরের যে আকু

এবং কালীনাম-কবচ সম্বল করিয়া ভবার্ণব পার হইবার যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। কালবশে দেশের কত কি বদল হইয়াছে, কিন্তু প্রসাদীসঙ্গীত দেবতার প্রসাদী নির্মাল্যের মত এখনও ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। বাঙলাদেশে যেমন একাধিক চণ্ডীদাস ছিলেন, তেমনি কাহারও কাহারও মতে, রামপ্রসাদও দুইজন ছিলেন। তন্মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক তিনি একজন কবিওয়ালা *; নাম সাদৃশ্যে দুইজনের পদের মধ্যে গোলমাল হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। ইনিও রামপ্রসাদের মত কালীভক্ত ছিলেন। বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কমলাকান্ত শ্যামাবিষক অনেক গান লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত গান রামপ্রসাদের সমকক্ষ না হইলেও কয়েকটি পদের ঐকান্তিক ভক্তি ও কবিত্ব রামপ্রসাদ অপেক্ষা ন্যূন নহে। কমলাকান্তের পদে ভাষাভঙ্গিমাগত ঐশ্বর্যের সঙ্গে একটা আসক্তিহীন বৈরাগ্য মিশিয়া গিয়াছে। শাক্তপদ-সাহিত্যে আরও কয়েকজন সাধকের পদাবলী বাঙালীর শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে; কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার বিবরণী প্রয়োজনীয় নহে।

॥ অনুশীলন ॥

১। বৈষ্ণবপদাবলী কাহাকে বলে? উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 'গৌরচন্দ্রিকা' কাহাকে বলে?

* ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত একদল কবি ও গায়কের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে বিশেষ অগ্রবর্তী না হইলেও, স্বভাবদত্ত কবিত্ব-শক্তির বলে আসরে দাঁড়াইয়া চটুল ভাষায় মুখে মুখে গান রচনা করিতে পারিতেন। ইঁহারা কবিওয়ালা।

২। বিদ্যাপতির পদাবলী কোন্ ভাষায় লিখিত? তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রহণ করা যায় কি? 'ব্রজবুলি' কাহাকে বলে?

৩। চণ্ডীদাস কয়জন?

৪। পদাবলীর চণ্ডীদসের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

৫। চৈতন্যোত্তর যুগের যে-কোন একজন শ্রেষ্ঠ পদকারের পরিচয় দাও।

৬। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস কাহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন?

৭। শাক্তপদাবলী কাহাকে বলে? মঙ্গকাব্যের সঙ্গে শাক্তপদাবলীর সম্পর্ক কি? শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কি? 'কালীকীর্তন' কাহাকে বলে?

৮। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পরিচয় দাও।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ আধুনিক যুগ

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

সূচনা ॥

উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা। ইংরাজ-অধিকারে বাঙালীর সমাজ, জীবন ও শিক্ষাদীক্ষার যে আমূল পরিবর্তন হইয়াছে, আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিষয়বস্তুর দিক হইতে এই যুগের বাংলা সাহিত্যের বিপ্লবী পরিবর্তন বিস্ময়কর। মানুষের বাস্তবজীবন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ইদানীন্তন কালের বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রচনারীতি ও ভঙ্গিমায়ও এই আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইবে। প্রথমে আমরা বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের পরিচয় লইয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অভিনব প্রেরণার স্বরূপ বুঝিয়া লইব।

আমরা অবলীলাক্রমে যে বাংলা গদ্য লিখিয়া যাই, তাহার ইতিহাস বিস্ময়কর। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৮০১ সালে বাংলা গদ্যগ্রন্থ সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। ইহার নাম 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', লেখক—রামরাম বসু। কিন্তু ইহার পূর্বেও বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল। একথা যথার্থ যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থ কবিতায় রচিত হইত। কিন্তু সে যুগের কাজকর্ম নির্বাহের ভাষা ছিল গদ্য। ১৬শ শতাব্দী হইতে গদ্যে রচিত চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। তবে তাহার সংখ্যা অতিশয় পরিমিত। ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈষ্ণব সহজিয়াগণ ছোট ছোট গদ্যবাক্যে সাধনভজন সংক্রান্ত তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহাকে 'কড়চা' বলে। গদ্যে রচিত আরও দুই একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই যুগের গদ্যের রচনারীতি নিন্দনীয় নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, খ্রীষ্টান পাদ্রীসম্প্রদায়ের নিকট বাংলা গদ্য বিশেষভাবে ঋণী। ইংরাজদের আগমনের পূর্বে পর্তুগীজ রোমানক্যাথলিক পাদ্রীসম্প্রদায় বাঙলাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া গীর্জা বানাইয়া দেশবাসীকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্মপ্রচারের জন্য বাংলা গদ্যগ্রন্থ ও বাংলা ব্যাকরণ-অভিধানের প্রয়োজন বোধ করিলেন। কিন্তু বিশেষ কোন গদ্য পুঁথি তাঁহাদের হাতে পৌঁছায় নাই, তখনও বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয় নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য দুইজন রোমান-ক্যাথলিক পাদ্রী বাংলা গদ্যগ্রন্থ লিখিলেন। ইঁহাদের অন্যতম দোম আন্তোনিও নামক এক ধর্মান্তরিত বাঙালী পাদ্রী ১৮শ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ' নামক প্রশ্নোত্তরযুক্ত গ্রন্থে খ্রীষ্টান ধর্মের মহিমা কীর্তন এবং হিন্দুধর্মের কুৎসা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থ ছাপা হয় নাই। রোমান হরফে লেখা ইহার পাণ্ডুলিপিটি পর্তুগালের এভোরা নগরে রক্ষিত আছে। মানোএল-দা-আস্-সুম্প্-সাঁও নামক একজন বিশুদ্ধ পর্তুগীজ পাদ্রী দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন: (১) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (২) 'পর্তুগীজ-বাংলা ব্যাকরণ'। মানোএলের পুস্তক দুইখানি পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে রোমান হরফে ছাপা হইয়াছিল; কারণ তখনও বাংলা অক্ষর মুদ্রণ কার্যে ব্যবহৃত হয় নাই। মানোএলের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'[১] খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা ১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। দোম্ আন্তোনিও বাঙালী ছিলেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থের ভাষা মানোএলের ভাষা অপেক্ষা সরল ও স্বাভাবিক। অবশ্য মানোএলও উত্তমরূপে বাংলা শিখিয়াছিলেন।

ইংরাজ দেশ অধিকার করিয়া শাসনকার্যে বাংলা ভাষার প্রয়োজন অনুভব করিল। শাসকগণ বিদেশী; তাঁহারা দেখিলেন সুশাসনের জন্য বাংলাভাষা

১ কৃপার শাস্ত্র—The Religion of Mercy, অর্থাৎ খ্রীষ্টান ধর্ম।

শিক্ষা করা প্রয়োজন। সুতরাং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ বাংলা-ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন; কেহ কেহ বাংলায় আইনগ্রন্থ অনুবাদ করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী হ্যালহেড কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলাভাষা শিক্ষার জন্য ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ (*The Grammar of the Bengal Language*)[১] রচনা করিলেন।

রেভারেণ্ড উইলিয়াম কেরী (১৭৬১—১৮৩৪) ॥

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে কেরী সাহেবের আবির্ভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উইলিয়াম কেরী নামক একজন ধর্মযাজক ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে ধর্মপ্রচারের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বাংলা গদ্য রীতিমত অনুশীলিত হইয়াছে। প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক তাঁহারই উদ্যোগে মুদ্রিত হইয়াছিল। এইজন্য বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে কেরী সাহেবের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য।

টমাস, ওয়ার্ড, মার্স ম্যান প্রভৃতি মিশনারীগণ এদেশে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি সহযোগী বন্ধুদের সঙ্গে শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন এবং ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে এখানে শ্রীরামপুর মিশন স্থাপন করেন। এই মিশনের ছাপাখানা হইতে ভারতের নানা ভাষায় অনূদিত বাইবেল প্রকাশিত হইয়াছিল। কেরী সাহেব বাংলা, সংস্কৃত, মারাঠী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন; বাংলাভাষা ও সাহিত্যেকেও তিনি ভালবাসিতেন। তাঁহার উদ্যোগে এই মিশনপ্রেস হইতে অনেক প্রাচীন বাংলা কাব্য মুদ্রিত হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তাঁহার যোগদান

১ মানোএলের ব্যাকরণের পর বিদেশীর লেখা ইহাই দ্বিতীয় ব্যাকরণ। ইহাতে সর্বপ্রথম বাংলা হরফ মুদ্রিত হইয়াছিল। পঞ্চানন কর্মকার এবং চার্লস উইলকিন্স্-এর সাহায্যে হ্যালহেড এক সেট বাংলা অক্ষর নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান ঘটনা। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ইংরাজ কর্মচারীদিগকে দেশীয় ভাষা, রীতিনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন (১৮০০)। কেরী সাহেব এই কলেজের বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষার ভার গ্রহণ করেন এবং বাঙালী পণ্ডিতদের সাহায্যে বাংলা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ তাঁহার উৎসাহে বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিজেও বেশ ভাল বাংলা লিখিতেন, বাঙালীর মতই বাংলা ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন। রেভাঃ কেরী বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এবং নানা সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রথম শিক্ষার্থীর সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কলিত বাংলা-ইংরাজী অভিধান দীর্ঘদিন বাঙালীর অভিধানের চাহিদা মিটাইয়াছিল। কেরী-অনূদিত বাংলা বাইবেলের (১৮০১) ভাষা কিন্তু মোটেই সুখপাঠ্য নহে। 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) তাঁহার রচিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। বাংলাভাষায় তাঁহার যেরূপ অধিকার ছিল, তাহাতে তিনি যে দুই-একখানি বাংলা গ্রন্থ লিখিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তবে 'কথোপকথনে' এমন সমস্ত গ্রাম্য চল্‌তি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে যে, ইহার সমস্ত অংশই তাঁহার রচনা বলিয়া মনে হয় না। কাহারও মতে 'কথোপকথন' রচনায় তিনি বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয় বা অন্য কোন পণ্ডিতের সাহায্য লইয়াছিলেন। 'ইতিহাসমালা' ইতিহাস নহে, নানা গল্প-কাহিনীর সঙ্কলন। ইহার ভাষা সহজ, সরল ও সাহিত্য-গুণান্বিত। কেরী বাইবেল্ অনুবাদে ভাষার জড়তা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বাংলাভাষায় তাঁহার যে অধিকার ছিল তাহার প্রমাণ এই 'ইতিহাসমালা'। বাংলাগদ্যের প্রথম যুগে তিনি পণ্ডিতদের গদ্যগ্রন্থ লিখিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থগুলিকে মুদ্রণ

প্রতিভাকে খর্ব করা যায় না। তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'শকুন্তলা' (১৮৫৫), 'মহাভারতের উপক্রমণিকা' (১৮৬০), 'সীতার বনবাস' (১৮৬৩), 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯) প্রভৃতি অনুবাদ হইলেও প্রায় মৌলিক গ্রন্থের মতই সুখপাঠ্য। শেক্সপীয়ারের *The Comedy of Errors* অবলম্বনে তিনি 'ভ্রান্তিবিলাস' লিখিয়াছিলেন। এই হাস্যরসাত্মক কাহিনীটি যে বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ, তাহা পাঠক বুঝিতেই পারিবেন না। তাঁহার মত দক্ষ অনুবাদক বাঙলাদেশে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

মৌলিক গ্রন্থ রচনাতেও তাঁহার অবদান যথেষ্ট। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ('সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' —১৮৫৩) রচনা করেন। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তিকাগুলিও মৌলিক রচনা, অনুবাদ নহে। তাঁহার স্বলিখিত ক্ষুদ্র আত্মজীবনীটি বাংলা সাহিত্যের একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রতিপক্ষদিগকে নাস্তানাবুদ করিবার জন্য "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" এই ছদ্মনামে কতকগুলি ব্যঙ্গপুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইহার কৌতুকাবহ ভাষা ও পরিহাসমুখর বর্ণনাভঙ্গিমায় বিদ্যাসাগরের আর এক প্রকার বিচিত্র গদ্যরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" একথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪—৮৩) ॥

সে যুগের কলিকাতায় বিদ্বজ্জন ও ধনিসমাজে অতিশয় মান্য প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক প্রথম বংলা উপন্যাসের রচনাকাররূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।[১] তিনি সাহিত্য-

১ 'আলাল' প্রকাশিত হইবার ছয় বৎসর পূর্বে ১৮৫২ সালে হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স নাম্নী এক ইংরাজ মহিলা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' নামক একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রে 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে অধিকতর পরিচিত। হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র এবং তদানীন্তন বাঙালী ও ইংরাজ-সমাজে শ্রদ্ধাস্পদ প্যারীচাঁদ ব্যবসাবাণিজ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সহজবোধ্য বাংলাভাষার সাহায্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যের বশে তিনি তাঁহার বন্ধু রাধানাথ শিকদারের [২] সহযোগিতায় ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে 'মাসিক পত্রিকা' নামক একখানি সহজ-বোধ্য সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে 'আলালের ঘরের তুলাল' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে এই উপন্যাস ১৮৫৮ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। প্যারীচাঁদ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; যথা,—'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'অভেদী' (১৮৭১), ইত্যাদি। ইংরাজী ভাষাতেও তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। অধ্যাত্মতত্ত্ব ও কৃষিতত্ত্বে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

'আলালের ঘরের তুলাল' বাংলা সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলিয়া পরিচিত। অবশ্য ইহাতে উপন্যাসের সমস্ত লক্ষণ নাই। ধনীর তুলাল মতিলাল কুসঙ্গে মিশিয়া কিরূপে অধঃপাতে গিয়াছিল, তাহাই এই উপন্যাসে বাস্তবতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। উপন্যাসটির সাহিত্যিক মর্যাদা যেরূপই হউক না কেন, এক বিষয়ে প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ রূপে সম্মান পাইয়াছেন। বাংলাভাষার সংস্কার সাধন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার পূর্বে সংস্কৃতগন্ধী বাংলাভাষাই সাহিত্য ক্ষেত্রে আধিপত্য করিতেছিল।

কাহারও কাহারও মতে ইহাই প্রথম বাংলা উপন্যাস্। ইহার ভাষা অতিশয় সহজ ও অনাড়ম্বর। বিদেশিনীর পক্ষে এইরূপ খাঁটি বাংলা ভাষায় গ্রন্থরচনা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। উপন্যাসটি খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া তৎকালীন বাঙালী সমাজে ইহার প্রচার হয় নাই।

২ রাধানাথ শিকদার ভারত সরকারের জমিজরীপ বিভাগে চাকুরী করিতেন। তিনি মাউন্ট এভারেষ্টের উচ্চতা প্রথম পরিমাপ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের ভাষা সুললিত হইলেও একটু গুরুভার বলিয়া কেহ কেহ সরল চলিতভাষার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেছিলেন। প্যারীচাঁদ মূলতঃ সাধুভাষার[১] কাঠামোর উপর 'আলাল' রচনা করিলেও বৈচিত্র্য ও স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্য এই উপন্যাসের বহুস্থলে কলিকাতার চলিতশব্দ ও বাংলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। মাঝে মাঝে তিনি অশিষ্ট গ্রাম্য শব্দ গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকিতে হইলে ভাষাও দৈনন্দিন জীবনের অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। প্যারীচাঁদ সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবলম্বিত লঘু ধরনের কৌতুকপ্রবণ রচনাভঙ্গিমা বাংলা সাহিত্যে 'আলালী ভাষা" নামে পরিচিত। তাঁহার পরে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া 'আলালী ভাষা' ও 'বিদ্যাসাগরী ভাষা'কে মিশাইয়া উপন্যাসের আদর্শ ভাষা সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু প্যারীচাঁদ মুখের কথা ও ঘরের ছবিকে উপন্যাসে প্রথম ব্যবহার করিয়া বাংলা গদ্যের নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—৮৬) ॥

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক এবং নানা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙলাদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক রূপে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। প্রথম যৌবনে কবিতা রচনা করিলেও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষয়কুমার বুঝিয়াছিলেন যে, মননশীল, বুদ্ধিদীপ্ত ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধই তাঁহার

১ 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা চলিয়া আসিতেছে। অনেক সমালোচক লিখিয়াছেন যে, প্যারীচাঁদ চলিতভাষায় উপন্যাস রচনা করেন ' ইহা কিন্তু ঠিক নহে। প্যারীচাঁদ বিশুদ্ধ চলিত ভাষায় কিছুই রচনা করেন নাই। তাঁহার ভাষা মূলতঃ সাধুভাষা। তবে তিনি প্রয়োজন স্থলে কলিকাতার চলিত বুলি যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। পুরাপুরি চলিত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত তাঁহার 'হুতোম-প্যাঁচার নক্শা' চলিত ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

আলোচনার প্রধান বিষয়। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে শিক্ষালাভ করিয়া এবং জেফ্রয় নামক এক শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকের সাহচর্যে আসিয়া তিনি য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁহার অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই তাঁহার সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমারের নিবন্ধগ্রন্থের মধ্যে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' (১ম ভাগ—১৮৫১, ২য় ভাগ—১৮৫৩), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬), এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' (১ম ভাগ—১৮৭০, ২য় ভাগ—১৮৮৩) প্রধান। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের দ্বারা নিজ মতামত প্রতিষ্ঠিত করেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে' ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে মৌলিক তথ্য ও গবেষণা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যদিও তিনি উইলসন সাহেব প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা রচনা করিয়াছিলেন, তবু তাঁহার নিজস্ব চিন্তাপ্রণালী কোথাও ব্যাহত হয় নাই। তিনি বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'চারুপাঠ' নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বহুদিন তাহা ছাত্রসমাজের একমাত্র পাঠ্যপুস্তক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার প্রায় সমস্ত রচনা অনুবাদমূলক হইলেও তৎকালীন বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের উন্নতির জন্য ইংরাজী জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের অনুবাদ বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। ভাবাবেগে-আপ্লুত বাংলা-দেশে বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়া চিন্তাবীর অক্ষয়কুমার বাঙালী-মনীষার এক বিস্ময়কর পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় লালিত্য-গুণের অভাব হইলেও চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্বকথা ব্যাখ্যায় ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭—৯৪) ॥

বাঙালী-মনীষার আর এক বিস্ময়কর উদাহরণ ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং ঐ বিদ্যায়তনের বিপ্লবী

শিক্ষক ডিরোজিও সাহেবের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইয়াও বিশুদ্ধ হিন্দু ভূদেব ভারতীয় ঐতিহ্যে আস্থা হারান নাই—এদেশের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহাকেই তিনি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই বলিয়া আধুনিক ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিও তাঁহার ঘৃণা জন্মে নাই। যাহার যেটুকু গ্রহণীয়, তাহাকে তিনি সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন।

বাঙলা গদ্যসাহিত্যে ভূদেবের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) ও 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫) নামক দুইখানি গ্রন্থে তিনি ইতিহাসের পটভূমিকায় গল্প-কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস ও শিক্ষাবিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি তৎকালীন বাঙলাদেশে শিক্ষা-সম্প্রসারণে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা বিকাশ লাভ করিয়াছে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) এবং 'আচার প্রবন্ধ (১৮৯৫) নামক তিনখানি গ্রন্থে। বাঙালীকে বড় হইতে হইলে ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, পারিবারিক কর্তব্য ও আদর্শ এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। ব্যক্তি হইতে পরিবার এবং পরিবার হইতে সমাজ—এইভাবে মানুষ ধীরে ধীরে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে। ভূদেব বাঙালীর বিধ্বস্ত সমাজ ও জীবনকে প্রাচীন ভারত ও নবীন য়ুরোপের আদর্শে নূতন রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। সেইদিক দিয়া তাঁহার এই গ্রন্থগুলির বিশেষ মূল্য আছে। তিনি সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখনী ধরেন নাই, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্রত এবং সেই ব্রত পালনের জন্য তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। হয়ত তাঁহার রচনাভঙ্গিমা ততটা সাহিত্য-গুণান্বিত নহে; কিন্তু সমস্ত গ্রন্থে তাঁহার পরিচ্ছন্ন মনের ছাপ পড়িয়াছে। ভূদেবের রচনারীতি রসযুক্ত না হইলেও প্রসাদগুণবিশিষ্ট, এবং সংযত জীবনাদর্শ ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—৯৪) ॥

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের দান বিস্ময়কর। গদ্য ভাষাব ক্রমিক অগ্রগতি এবং চিন্তামূলক প্রবন্ধসাহিত্যের রূপনির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্র যে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন ইংরাজ মনীষী ফ্রান্সিস্ বেকনের সহিত তাহাব সাদৃশ্য দেখা যাইবে। বেকন পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির সমস্ত সংবাদ বাখিলেও প্রাচ্য দেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতেন না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন।

সাধারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক বলিয়া জানে। কিন্তু তাঁহাব প্রবন্ধের পরিচয় লইলে আমবা দেখিব যে, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে একমাত্র ববীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহাবও সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা সম্পাদনা করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন যে, উচ্চতর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা বাংলা গদ্যে নাই বলিলেই চলে। যাঁহারা ইংরাজী বা সংস্কৃত জানিতেন তাঁহাবা সেই-ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানেব তৃষ্ণা মিটাইতেন। বাংলা যাঁহাদের মাতৃভাষা তাঁহাদের দুর্গতির সীমা ছিল না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব সকলেই প্রবন্ধ পুস্তক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম ও সমাজ লইয়া তর্কবিতর্কই তাঁহার বারো আনা অংশ অধিকার করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই সবপ্রথম প্রবন্ধকে সাহিত্যের কৌলীন্য দান করিলেন। তাঁহার প্রবন্ধসমূহ একদিকে যেমন তত্ত্বনিষ্ঠ ও তথ্যবহ, তেমনি অপরদিকে মৌলিক ও শিল্পগুণান্বিত। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মদর্শন, শিল্পকলা—এমন কোন বিষয় নাই যাহা অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যগুণান্বিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা কবেন নাই। 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'বিজ্ঞান-রহস্য' (১৮৮৫), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ-প্রবন্ধে'র দুইখণ্ড (১৮৮৭, ১৮৯২), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার চিন্তাঋদ্ধ মনন, যুক্তিবাদ, তথ্যনিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণশক্তি, আধুনিক মনোভাব প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ-

লক্ষণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' সে যুগে নব্য বাঙালীর চিন্তাস্রোতকে বহন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রিকায় শুধু নিজে প্রবন্ধ রচনা করেন নাই, তাঁহার অনেক শিষ্যকেও ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া একটি শক্তিশালী প্রাবন্ধিক-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হইয়াছিল; বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইহার গোষ্ঠীপতি।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু জ্ঞানের কথাকেই প্রবন্ধে প্রাধান্য দেন নাই। তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহাকেই সরস করিয়া তুলিয়াছেন। 'বিজ্ঞান রহস্য' নামক গ্রন্থে তিনি এমন সরস ভঙ্গীতে বিজ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরবর্তিকালে জগদীশচন্দ্র, জগদানন্দ রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সকলেই বিজ্ঞান আলোচনায় এই রীতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) ঠিক প্রবন্ধ পুস্তক না হইলেও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামক এক আফিমখোর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উক্তিরূপে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছিল। কমলাকান্ত অফিমের ঝোঁকে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতেন এবং আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের হাস্যকর অসঙ্গতিকে উদ্ঘাটিত করিতেন। ডি-কুইন্সি নামক এক ইংরাজ লেখকের *Confessions of an English Opium Eater* (1812) নামক গ্রন্থের আদর্শে 'কমলাকান্তের দপ্তর' রচিত হইলেও ইহার মৌলিকতা সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের যে দার্শনিকতা, শিল্পবোধ, রোম্যান্টিক কবিচেতনা এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে উদার অনাসক্তভাব বিকাশ লাভ করিয়াছে, ডি-কুইন্সির রচনায় তাহা পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করিয়াও 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক গ্রন্থে শাস্ত্রসংহিতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন প্রবন্ধের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বাঙলার প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪—১৯১৯) ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বাঙলার মননশীল প্রবন্ধসাহিত্য অন্যান্য শাখার মত সুগঠিত নহে। আবেগ-ব্যাকুল বাঙালী চিন্তাধর্মী রচনায় বিশেষ আনন্দ অনুভব করে না। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথা স্মরণ রাখিলে এই মন্তব্য সত্য বলিয়া মনে হইবে না। বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই যদি কাহাকেও মননশীল প্রাবন্ধিকের যথার্থ মর্যাদা দিতে হয়, তাহা হইলে সে মর্যাদা দাবী করিবেন রামেন্দ্রসুন্দর। আচার্য ত্রিবেদী বৃত্তিতে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন; বাঙালী ছাত্রসমাজে বিজ্ঞানের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি তাঁহার একটা বড় কীর্তি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ চিন্তাশীল প্রবন্ধসাহিত্যে তিনি যে বিচিত্র ও বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন, বাংলা সাহিত্য দূরের কথা, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেও তাহার তুলনা নাই।

পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গতিবিজ্ঞান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা এবং বৈদিকসংহিতা, বেদান্ত, পাশ্চাত্য দর্শন প্রভৃতি তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ অধিকার ছিল। সেই সমস্ত দুরূহ চিন্তাগ্রাহ্য ব্যাপারকে তিনি 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'বিচিত্রজগৎ' (১৯২০), 'যজ্ঞকথা' (১৯২০), প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থূল পদার্থজগৎ এবং সূক্ষ্ম দার্শনিক জগৎ—উভয় বিষয়েই তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ইহার কর্ণধার হইয়াছিলেন এবং বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক কথায় তাঁহার মধ্যে সর্বতত্ত্বদর্শী প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছিল। তত্ত্ব-দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার প্রবন্ধের ভাষা তাঁহার চরিত্রের মত ভাস্বর, হাস্যময় ও প্রাণরসোজ্জ্বল। তত্ত্বকথাও যে রসসাহিত্যের মত চিত্তগ্রাহী হইতে পারে, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষাই তাহার বড় প্রমাণ।

আধুনিক যুগে নাটক ও নাট্যমঞ্চ ॥

আধুনিক বাংলা নাটক যাত্রা হইতে জন্মলাভ করে নাই। ইংরাজ-আগমনের পর এদেশে নাটকাভিনয় প্রচলিত হয়। কলিকাতার ইংরাজ-কর্মচারিগণ নিজস্ব থিয়েটারে ইংরাজী নাটক অভিনয় করিতেন। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দেরও পূর্বে কলিকাতায় লালবাজারের উত্তর-পূর্বকোণে 'প্লে হাউস' ইংরাজদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গমঞ্চ। ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা থিয়েটার' একদা ইংরাজমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ শুধু ইংরাজী নাটকেরই অভিনয় করিতেন না, ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে ইঁহারা '*The Indian Drama of Sakuntolla* or *The Fatal Ring*' নামে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ইংরাজী অনুবাদ অভিনয় করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বর্তমান প্রসঙ্গে ইংরাজদের রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃত আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে।

বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে হেরাসিম লেবেডেফ নামক এক রুশীয় পরিব্রাজকের নাম জড়াইয়া গিয়াছে। লেবেডেফ সাহেব ১৭৯৫ সালে কলিকাতার ডোমতলা লেনে 'নিউ থিয়েটার' নামক রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া বাঙালী নটনটী ও দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে দুইখানি ইংরাজী নাটকের বঙ্গানুবাদ (*Love is the Best Doctor* এবং *The Disguise*) অভিনয় করাইয়াছিলেন। বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ইহাই বাঙলাদেশে বাংলা নাটকের প্রথম মঞ্চাভিনয়।

দেশে তখন যাত্রাভিনয়ের প্রভাব থাকিলেও ইংরাজের রঙ্গমঞ্চে ইংরাজী নাটকের অভিনয় দেখিয়া নব্যশিক্ষিত বাঙালীরা নাট্যাভিনয়ের ইচ্ছা পোষণ করিতে লাগিল। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই অভিপ্রায়ে বেলিয়াঘাটা শুঁড়া অঞ্চলে হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করেন। এখানে শেক্সপীয়ারের নাটক এবং ভবভূতির সংস্কৃত নাটকের ইংরাজী অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল। অল্পকালের মধ্যে এই থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল বটে,

কিন্তু স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অভিনয় করিবার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রেরা ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরাজী নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। তখনও বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয় নাই, কারণ বাংলা নাটক রচিত হয় নাই। ১৮৩৩ সালের দিকে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে একখানি বাংলা নাটক (বিদ্যাসুন্দর) অভিনীত হয়। তারপর ১৮৫৭ সালে আশুতোষ দেবের বাড়ীতে মহাসমারোহে শকুন্তলা নাটক (বঙ্গানুবাদ) মঞ্চস্থ হইয়াছিল। ইহার পর অনেকেই বাংলা নাটক সম্বন্ধে উৎসাহিত হইয়া পড়িলেন এবং কয়েকখানি নাটকও রচনা করিলেন। তন্মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২)[১], তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২)[২] রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' (১৮৫৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণ তর্করত্ন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'কুলীনকুলসর্বস্ব' বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলিত।

ইহার পর আরও নানাস্থানে নাটমঞ্চ স্থাপন করিয়া অভিনয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮), পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় (১৮৬৫), জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৬৭), বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় (১৮৬৮)[৩] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদনের প্রথম রচনা 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনীত হইয়াছিল (১৮৫৯)। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্র-

১ 'কীর্তিবিলাস' বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' সার্থক ট্র্যাজেডি হইলেও প্রথম ট্র্যাজেডি নয়।

২ 'ভদ্রার্জুন' নাটকে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য নাট্যকলা অনুসৃত হয়।

৩ এখানে বন্ধনীর মধ্যে প্রথম অভিনয়ের বৎসর উল্লিখিত হইয়াছে।

নাথ, গুণেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুরবাড়ীর তরুণগণ ইহাতে মহোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন।

কলিকাতার দেখাদেখি মফঃস্বল শহরেও অভিনয় শুরু হইয়া গেল। অবশ্য এই সমস্ত অভিনয় নিতান্তই ধনীর সখের ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছিল। অভিজাত-সমাজের কর্ণধারগণই এইরূপ ব্যয়সাপেক্ষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন; ইহাতে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন ব্যতীত সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৮৭২ সালে 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্বপ্রথম রঙ্গালয়ে টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইল।[৪] সুতরাং ১৮৭২ সালের পূর্ববর্তী নাট্যাভিনয়কে সখের অভিনয় বলা চলিতে পারে। ইহার পর বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ নূতন পথে যাত্রা করিল। ইহার পর ধনীর খেয়াল-খুশীর উপর নাট্যাভিনয় নির্ভর করিত না; সামান্য দর্শনীর বিনিময়ে যে-কেহ অভিনয় উপভোগ করিতে পারিত। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের চাহিদার ফলে নাট্যকারগণ নাটক রচনাতে উৎসাহিত হইলেন। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যেই কলিকাতা শহরে একাধিক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইল, এবং তাহাতে বাংলা নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইতে লাগিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—৭৩) ॥

মধুসূদন যেমন বাংলা কাব্যসাহিত্যে প্রাণরসপূর্ণ আধুনিকতার সূচনা করেন, তেমনি বাংলা নাটকেরও নবকলেবর দান করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব নাট্যকাররূপে। তিন-চারখানি নাটক লিখিবার পর তিনি কাব্য রচনায় ব্রতী হন। তাঁহার পূর্বে বাঙলাদেশে পাশ্চাত্ত্য রীতি-অনুযায়ী নাটক রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অভিনয়যোগ্য ও সাহিত্যগুণান্বিত নাটকের প্রথম রচনাকার মধুসূদন। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে বেলগাছিয়া নাট্য-

৪ ন্যাশন্যাল থিয়েটার বাঙলার সর্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয় হইলেও তাহার পূর্বে ঢাকা শহরে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় হইয়াছিল।

শালায় রামনারায়ণ তর্করত্ন-অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দর্শনে আমন্ত্রিত হইয়া মধুসূদন নাটক রচনায় উৎসুক হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, উক্ত নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষক পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধ ভূস্বামী সিংহভ্রাতৃদ্বয় একখানি অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। উৎকৃষ্ট নাটক রচনার অভিলাষে মধুসূদন 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র লাইব্রেরী হইতে কয়েকখানি সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ আনাইয়া পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম বাংলা রচনা। বাংলা সাহিত্যে যে তাঁহার অধিকার ছিল, ইতিপূর্বে তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; পুলিসকোর্টের দোভাষী মাইকেল মধুসূদন দত্ত তখন *The Captive Lady*, *The Visions of the Past* এবং আরও কিছু টুকরা কবিতা লিখিয়া ইংরাজী-জানা মহলে কবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তখন তাঁহার কোন অধিকার জন্মে নাই। উপরন্তু তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্মুখে হিন্দুসমাজের দ্বারও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই মধুসূদন মহাভারতের যযাতি, দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার কাহিনী অবলম্বনে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক (১৮৫৮) রচনা করিলেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে শর্মিষ্ঠা মুদ্রিত হয় এবং সেই বৎসরের ৩রা সেপ্টেম্বর উহা মহাসমারোহে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। এই নাটকাভিনয় দর্শনের পর বাঙালী ও ইংরাজসম্প্রদায়[১] একদিনেই মধুসূদনের প্রতিভার পরিচয় পাইল। নাট্যকার মধুসূদনের যশে আর সকলের খ্যাতি আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

মহাভারতের আদিপর্বে যযাতি, দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মধুসূদন ইহাকেই কিছু অদল-বদল করিয়া গ্রহণ করেন। 'শর্মিষ্ঠা'

---

১ সে যুগে অভিনয়াদি আনন্দানুষ্ঠানে ইংরাজ কর্মচারিগণ আমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য অভিনেতব্য নাটকের ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিতরিত হইত। সুতরাং বাংলা নাটক বুঝিতে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইত না।

তাঁহার প্রথম রচনা, তাই ইহাতে নানা ত্রুটী লক্ষ্য করা যায়। যাত্রার ঢঙে রচিত দীর্ঘ উক্তি ও অতিনাটকীয়তার ফলে এই নাটকের ঘটনার তীক্ষ্ণতা ও প্রবহমানতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভাষাবিন্যাস সংস্কৃতের অনুরূপ হওয়ায় নাটকখানি অত্যন্ত কৃত্রিম, আলঙ্কারিক ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত ত্রুটী সত্ত্বেও 'শর্মিষ্ঠা' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; কারণ মধুসূদন মহাভারত হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিলেও প্রয়োজনমত কাহিনীকে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। সে যুগে কেহ এরূপ পরিবর্তনের দুঃসাহস দেখাইতে পারিত না। যাহা হউক, 'শর্মিষ্ঠা' বিশেষ অভিনয়-সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল; মধুসূদন প্রথম নাটকেই নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। অবশ্য ইহার পূর্বে তাঁহার দুইখানি প্রহসন ('একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ') রচিত হইয়াছিল। 'পদ্মাবতী' পৌরাণিক ধরনের সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাটক। গ্রীক উপখ্যানে **'Apple of Discord'** নামক একটি গল্প প্রচলিত আছে। একটা সোনার আপেল লইয়া জুনো, ভিনাস এবং প্যালাস নাম্নী তিনজন দেবীর মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল। যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী ঐ সোনার আপেল তাহারই হইবে। প্যারিসের উপর বিচারের ভার পড়িল। তিনি ভিনাসকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং হেলেন নাম্নী সুন্দরী রমণীকে লাভ করেন। ইহাই ট্রয় যুদ্ধের সূচনা। মধুসূদন এই কাহিনীটিকে ভারতীয় পুরাণের ছাঁচে ঢালিয়া নাটক রচনা করিলেন। 'শর্মিষ্ঠা' অপেক্ষা 'পদ্মাবতী'র কাহিনী, চরিত্র, ভাষা ও নাটকীয়তা অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ভাষার মধ্যে সংস্কৃত রণের প্রভাব (বিশেষতঃ শকুন্তলার প্রভাব) একেবারে বিদূরিত না হইলেও সংলাপের অভিনয়-যোগ্যতা অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। এই নাটকে মধুসূদন সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নামক বিয়োগান্ত নাটক বা

ট্রাজেডি প্রকাশিত হয়। নানাদিক দিয়া 'কৃষ্ণকুমারী' বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ইহার কাহিনী ঐতিহাসিক। মধুসূদনের প্রথম দুইখানি নাটক পৌরাণিক পরিমণ্ডল ত্যাগ করিতে পারে নাই। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'র ঘটনা পরিচিত ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। টড্ প্রণীত ***Annals and Antiquities of Rajasthan*** নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত রাজপুত-ইতিহাসের একটি শোকাবহ ঘটনা ইহার মূল কাহিনী। রাজ্যের কল্যাণে কৃষ্ণকুমারীর প্রাণত্যাগ এবং কন্যার শোকে রাণা ভীমসিংহের উন্মাদ হইয়া যাওয়ার কাহিনী—ইহাতে গভীর বেদনার সঞ্চার করিয়াছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে মধুসূদন অনেকটা গ্রীক ট্রাজেডির ছাঁচে রচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নাট্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহাতেই জীবনের গভীর ও বিষাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয়—যাহার পূর্ণ পরিচয় 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাবণ-চরিত্রে পাওয়া যাইবে। 'কৃষ্ণ-কুমারী' বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্রাজেডি না হইলেও[৬] প্রথম সার্থক ট্রাজেডি, তাহাতে সন্দেহ নাই। মধুসূদন শেষজীবনে 'মায়াকানন' (১৮৭৪) নামক একখানি বিষাদান্ত নাটক রচনা করেন। তখন তাঁহার প্রতিভা অস্তমিত হইতে চলিয়াছে। তাই ইহাতে প্রশংসনীয় নাট্য-লক্ষণ পাওয়া যায় না।

প্রহসন রচনাতেও মধুসূদন অদ্ভুত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা এমন বৈচিত্র্যমণ্ডিত ছিল যে, তিনি একই সময়ে করুণরসাত্মক ও হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করিতে পারিতেন। 'পদ্মাবতী' রচনার সময় তাঁহার দুইখানি প্রহসনও রচিত হয়:—'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। প্রথমটিতে ইংরাজী-শিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল যুবসমাজের কদাচার বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু এক

---

৬ ইহার পূর্বে দুইখানি ট্রাজেডি রচিত হইয়াছিল :—

(১) যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত—কীর্তিবিলাস (১৮৫২)

(২) উমেশচন্দ্র মিত্র—বিধবা-বিবাহ (১৮৫৬)

মুঘলযুগের কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা, চরিত্রদ্বন্দ্ব, স্বার্থবিদ্বেষ ও হানাহানির প্রচুর উপাদান ছিল। তাই তাঁহার নাটকে মুঘলযুগের প্রাধান্য। তন্মধ্যে 'সাজাহান' ও 'নূরজাহান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাজাহান নাটকে সাজাহানের চরিত্রে স্নেহ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দ্বন্দ্ব এবং নূরজাহানের চরিত্রে নারীত্বের সহিত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চমৎকার ফুটিয়াছে। রচনারীতির দিক দিয়া 'নূরজাহান' সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও, মানবিক আবেদনের জন্য 'সাজাহান' অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' হিন্দুযুগের গৌরবময় কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অবশ্য ইহাতে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালীর রঙ্গমঞ্চকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এখনও পর্যন্ত ইহাদের জনপ্রিয়তা খর্ব হয় নাই। বাঙলার বাহিরেও দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ প্রভাব আছে। হিন্দী নাট্যসাহিত্য অনুবাদের মারফতে দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক নাটককে গ্রহণ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, তিনি নাকি ঐতিহাসিক নাটকে কোথাও ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। একথা সর্বতোভাবে সত্য নহে। নাটকীয় রস ঘনীভূত করিবার জন্য যেখানে প্রয়োজন কেবলমাত্র সেখানেই তিনি ইতিহাসকে যৎসামান্য পাল্টাইয়া লইয়াছেন। ঐতিহাসিক নাটকে ইহা অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার সময়ে যেটুকু ঐতিহাসিক উপাদান তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের নানাগুণ সত্ত্বেও কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি আছে, যাহার জন্য তিনি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। অতিনাটকীয়তা ও গুরুগম্ভীর আলঙ্কারিক ভাষা তাঁহার নাটকের নাটকত্ব অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সংলাপ নাটকের প্রধান অঙ্গ। তাহাতে তিনি কবিত্ব সঞ্চার করিয়াছেন, বক্তৃতার ঢঙে

ভাষাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে সুস্পষ্ট করিতে পারেন নাই। উপরন্তু তিনি মানুষের বাস্তব চরিত্রকে বাদ দিয়া উচ্চতর আদর্শলোকের মহিমান্বিত রূপ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শূন্যগর্ভ বাক্যবীর চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। মনে হয়, তাহারা যেন নাট্যকারের ধমক খাইয়া পড়া বুলি মুখস্থ বলিয়া যাইতেছে। ভাষার এই কৃত্রিমতা তাঁহার অধিকাংশ নাটকের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তিনি আলোচনাদিতে শেক্সপীয়ারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেও জার্মান নাট্যকার শীলারের দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। শীলারের দোষগুণ উভয়ই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে পরিলক্ষিত হয়। গিরিশচন্দ্রের নাটক খুব উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও তাহাতে কৃত্রিমতা নাই, ভাষার আলঙ্কারিক বাড়াবাড়ি নাটকীয় রসকে নষ্ট করিয়া দেয় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' (১৯১২) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) নামক সামাজিক নাটক দুই খানিতে গিরিশচন্দ্রের স্পষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। ইহাতে তাঁহার প্রতিভার সম্মান বাড়ে নাই।

বাঙলাদেশে নাটক নাটমঞ্চ ও নাট্যকলার অভূতপূর্ব বিকাশ হইলেও প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের এখনও অভাব আছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বাঙলার শ্রেষ্ঠ লেখকগণ কাব্য ও গদ্য সাহিত্যকে যেমন বিশ্বে বরণীয় করিয়াছেন, বাংলা নাটকে সেরূপ সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাটক অপূর্ব শিল্পগুণান্বিত হইলেও আঙ্গিক ও নাট্যকলা সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। ইদানীং আধুনিক জীবন-সমস্যাকে উপাদান করিয়া নানা ধরনের নাটক রচিত হইতেছে; নাটমঞ্চেরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু এখনও উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব দূর হয় নাই।

॥ **অনুশীলন** ॥

১। বাঙলাদেশে কেমন করিয়া নাটকাভিনয় শুরু হইল? হেরাসিম লেবেডেফ কে ছিলেন?

২। মাইকেল মধুসূদনের পূর্ববর্তী বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের পরিচয় দাও।

৩। সংক্ষেপে মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দাও। তাঁহার কৃষ্ণকুমারী নাটক কি জন্য বিখ্যাত?

৪। "মধুসূদন গভীর রসের নাটক রচনায় যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তেমনি লঘু প্রহসন রচনায়ও আশ্চর্য সফলতা লাভ করিয়াছিলেন"—আলোচনা কর।

৫। দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে কি জন্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন? মধুসূদনের তুলনায় তাঁহার নাট্যপ্রতিভা বিচার কর।

৬। "দীনবন্ধুর বিষাদান্ত নাটক নাটক-হিসাবে ব্যর্থ হইলেও নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য"—আলোচনা কর।

৭। "দীনবন্ধুর প্রতিভা প্রধানতঃ প্রহসন রচনার প্রতিভা"—ব্যাখ্যা কর।

৮। নাটক, নাটমঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ে গিরিশচন্দ্র মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন—সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা যায় কি?

৯। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক ও ভক্তিরসের নাটকে যে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্ণয় কর। তাঁহার ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকে কোনরূপ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় কি?

১০। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলির স্বরূপ বিচার কর। তাঁহার নাট্যপ্রতিভার গুণ ও ত্রুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। তাঁহার নাটকের ভাষা সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি?

সপ্তম অধ্যায়

উপন্যাস ও ছোটগল্প

সূচনা ॥

গল্পের প্রতি মানুষের কৌতূহল চিরন্তন। প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ কবিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষ যাহা কিছু রচনা করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই আখ্যান-উপাখ্যান। প্রাগৈতিহাসিক বর্বর মানুষ শিকারের পর দিনশেষে গুহাবাসে ফিরিয়া নৃত্যগীতে ভোজসভা ও অরণ্য-অন্ধকার চমকিত করিয়া তুলিত। সেই নৃত্যগীতের পশ্চাতেও কোন একটা শিকার-কাহিনী অথবা শত্রুদলনের জিঘাংসা লুকাইয়া থাকিত। তাবপর মানুষ সভ্যতায় অগ্রসর হইয়াছে, লিপি আবিষ্কার করিয়াছে, কাহিনী-মহাকাব্য রচনা করিয়াছে। কিন্তু তাহার গল্প শুনিবার ইচ্ছা হ্রাস পায় নাই। প্রাচীন যুগে মানুষের অভিজ্ঞতা, জ্ঞানবিশ্বাস সীমাবদ্ধ ছিল; জগৎ ও জীবনের প্রতি রহস্যময় অলৌকিক মনোভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই সে যুগের গল্প-কাহিনীতে ভূতপ্রেত, রাক্ষসখোক্কস, দৈত্যদানব, হুরী-পরীর প্রাধান্য। সভ্যতায় অগ্রসর হইয়াও সে অলৌকিক জগতের আকর্ষণ ভুলিতে পারে নাই। রাজপুত্র-রাজকন্যা, কল্পনার রাজত্ব প্রভৃতি তাহার আধুনিক বাস্তব চেতনাকেও আনন্দরসে ভরিয়া তোলে।

যে কাহিনীতে কল্পনার প্রাধান্য এবং বাস্তবতা সঙ্কুচিত তাহাকে ইংরাজীতে রোমান্স্ (Romance) বলে। আধুনিক উপন্যাসের মূল এই রোমান্সে নিহিত। ঈশপের গল্প, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, দশকুমারচরিত, কথাসরিৎ-সাগর, জাতক-কাহিনী, বোকাচিও নামক ইতালীয় লেখকের 'ডেকামেরন'— প্রভৃতিতে কোথাও মানবজীবনের আখ্যান, কোথাও বা জীবজন্তুর রূপকে মানুষের জীবনকথা গদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। তারপর কাল অগ্রসর হইয়াছে, মানুষ ক্রমে ক্রমে সমাজ ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে।

১৮শ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই যুরোপের মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা এবং নানা সামাজিক আন্দোলনের সাহায্যে বাস্তব মানুষের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছিল। তখন হইতেই যুরোপের গদ্য কাহিনীগুলি ক্রমে ক্রমে উপন্যাসে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাস্তব মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসের বক্তব্য বিষয়ে পরিণত হইলে সাহিত্যক্ষেত্রে এই শাখাটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে লোকে কখনও অদ্ভুত আখ্যায়িকা কখনও-বা মহাকাব্যের বিশাল কাহিনী পড়িয়া বা শুনিয়া আনন্দ পাইত; আধুনিক কালের উপন্যাসে এযুগের পাঠক দৈনন্দিন জীবনের বেদনামাধুরী উপলব্ধি করিয়াছে। উপন্যাসের প্রথম দিকে রোমান্স, ইতিহাস, অলৌকিকতা ও কল্পনার প্রাধান্য থাকিলেও ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে যুরোপে সমসাময়িক সমাজ ও বাস্তব মানুষকে কেন্দ্র করিয়াই অধিকাংশ উপন্যাস রচিত হইয়াছে। ইদানীন্তন যুরোপীয় উপন্যাসে আধুনিক জগতের ব্যক্তি, পরিবেশ এবং মনস্তত্ত্বের বিচিত্র বিস্ময় প্রাধান্য পাইতেছে।

বাঙলাদেশে প্রাচীনযুগে মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে আখ্যান-উপাখ্যান থাকিলেও তাহাকে বাস্তব কাহিনী বলা যায় না। আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবিগণের, বিশেষতঃ সৈয়দ আলাওলের কাব্যে মানব-জীবন-কাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গগীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকায়ও দেবপ্রভাববর্জিত মানবজীবনের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।[1] মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র দেবতার কথা বলিলেও দেবতাকে মানুষ করিয়া আঁকিয়াছেন। কিন্তু উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ইংরাজ-আমলেই সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজযুগে বাঙালীর মধ্যযুগীয় সমাজচেতনা ও পুরাতন দেববিশ্বাস যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ১৯শ শতাব্দীতে বাস্তব জীবনের নানা সমস্যা শিক্ষিত বাঙালীকে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

১ এই আখ্যায়িকাগুলিতে বাস্তব মানবের আশ্চর্য স্পর্শ থাকিলেও ইহাদের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা লইয়া নানা সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে।

কেহ কেহ রোমান্স অবলম্বনে পুরাতন আমলের গল্প লিখিলেও আধুনিক জীবনের উচ্চকিত কোলাহলে সে স্নিগ্ধমাধুরী ম্লান হইয়া গেল। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে' সর্বপ্রথম বাস্তব জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার পূর্বে সাময়িক পত্রাদিতে বাস্তব জীবনের অনাচারকে কেন্দ্র করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক নক্‌শা-শ্রেণীর আখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি উপন্যাস নহে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে উপন্যাসের অনেক উপাদান নিহিত ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫), 'নববিবি বিলাস (১৮৩১) প্রভৃতি পুস্তিকা এই জাতীয় রচনা। অবশ্য প্যারীচাঁদের অল্প পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক কাহিনীর সহিত রোমান্স ও কল্পনার খাদ মিশাইয়া দুইখানি আখ্যায়িকা ফাঁদিয়াছিলেন —'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) ও 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্বে ভূদেবের কাহিনীতেই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য ধরনের রোমান্স-ধর্মী উপন্যাসের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। কিন্তু বঙ্কিম-প্রতিভায় ভূদেবের উপন্যাস ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—৯৪) ॥

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা ও পরিপোষ্টা। তাঁহার সমকালে প্রাচীন সংস্কৃত আখ্যানের অনুবাদ এবং ইংরেজী গল্পের কাহিনী পড়িয়া লোকে গল্প পাঠের ক্ষুধা মিটাইত। দেশের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজে তখন ইংরাজী শিক্ষা, সাহিত্য ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করিতেছিল। বাঙালী ইংরাজী ভাষার মারফতে পাশ্চাত্ত্য উপন্যাস-সাহিত্যের রস আস্বাদন করিয়া বাংলা ভাষাতেও তাহার অবতারণার কথা ভাবিতেছিল। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল', কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭), 'পৌল ভর্জীনী' (১৮৬৯), ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭), 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫), গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়বল্লভ'

(১৮৬৩) প্রভৃতি আখ্যানে তাহার প্রথম ইঙ্গিত মিলিল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মত অসামান্য মৌলিক প্রতিভার প্রয়োজন ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত আখ্যান-আখ্যায়িকার ধারা ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের আদর্শে, বিশেষতঃ স্যার ওয়াল্টার স্কটের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং শেক্সপীয়রীয় ভাবরসে অবগাহন করিয়া এমন বিচিত্র ও বিবিধ ধরনের উপন্যাস রচনা করিলেন যে, শুধু তাঁহার একক চেষ্টার ফলেই বাংলা উপন্যাস শৈশব ছাড়াইয়া যৌবনে উপনীত হইল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং আধুনিক কালের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের নাম স্মরণ করিয়াও বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। উপন্যাস রচনা করিতে গেলে প্রধানতঃ চারিটি লক্ষণ প্রয়োজনঃ (১) বাস্তব কাহিনী (২) বাস্তব চরিত্র (৩) মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সাহায্যে চরিত্র বিকাশ (৪) মানবজীবন সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের উদার অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি। বলা বাহুল্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসে এই গুণগুলির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। কাহিনী বা বাস্তব চরিত্র তাঁহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে। প্যারীচাঁদের ঠকচাচা, মতিলাল, বাবুরাম বাবু এবং ভবানীচরণের 'নববাবু'গণ তদানীন্তন দেশ ও কালেই জন্মলাভ করিয়াছিল। কিন্তু উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, পাত্রপাত্রীর বিভিন্ন প্রবৃত্তির সংঘর্ষ এবং সেই সংঘর্ষের মধ্য দিয়া চরিত্রের বিবর্তন তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি। অবশ্য তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসে একটা আদর্শায়িত বিশাল জীবনের চিত্র আশ্চর্য বর্ণাঢ্য কল্পনার দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে। তাহার ফলে কোন কোন সময় চরিত্র ও কাহিনী বাস্তবজীবনের বিবর্ণতা ত্যাগ করিয়া জ্যোতির্ময় রোমান্টিক লোকে স্বপ্নপ্রয়াণ করিয়াছে। তখন বাঙলাদেশে সমাজ ও আদর্শ লইয়া ভাঙাগড়া চলিতেছিল; তাই বাস্তব বাঙলার বুকে একটা আদর্শ বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বঙ্কিমের সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। এই জন্য তাঁহার

উপন্যাসে দৈনন্দিন জীবনের ভাঙাচোরা কুশ্রীতার চেয়ে একটা পূর্ণতর জীবনের সর্বাঙ্গীণ চিত্রই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। তাহা হইলেও কাহিনী-গ্রন্থন, চরিত্র-সৃষ্টি ও বিকাশে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনাস্থল বিরল।

১৮৬৫ খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঙলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। ইহার কিছু পূর্বে তিনি '*Rajmohan's Wife*' নামক একখানি ইংরাজী উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে 'Indian Field' নামক সাময়িক পত্রে উহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইলেও তাঁহার জীবিতকালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৫ হইতে ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দ—মোট ২২ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত তাহার ১৪ খানি উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে :—দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮৪), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪), রাধারাণী (১৮৮৬) এবং সীতারাম (১৮৮৭)। নানা কাজে ব্যস্ত থাকিয়া এত অল্পসময়ের মধ্যে এতগুলি উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অদ্ভুত সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(ক) ইতিহাস ও রোমান্স—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ ও সীতারাম।

(খ) তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধ—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী।

(গ) সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবন—বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাধারাণী।

এই তালিকা হইতেই বুঝা যাইবে যে, বঙ্কিম-প্রতিভা কত বিচিত্রমুখী। ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্সের রস মিশাইয়া রচিত তাঁহার উপন্যাসগুলি আদর্শ

রোমান্টিক উপন্যাস হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রয়োজনস্থলে ইতিহাসকে পাল্টাইয়া লইয়াছেন। ইহাতে এমন কোন দোষ হয় নাই। কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল লক্ষ্য ইতিহাস ঘটিত তথ্য বিবৃতি নহে; ঐতিহাসিক দেশকালের ঔপন্যাসিক রূপ ফুটাইয়া তোলাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য। রোমান্স-আশ্রয়ী উপন্যাসের মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' বাংলা সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি; ভারতীয় সাহিত্যেও ইহার তুলনা পাওয়া যায় না। জনসংযোগের বাহিরে, অরণ্যসমুদ্রের পরিবেশে লালিত-পালিত কপালকুণ্ডলা নাম্নী এক তরুণীর সঙ্গে সপ্তগ্রাম নিবাসী নবকুমারের বিবাহ হয়। ইহার ফলে অরণ্যদুহিতা কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যজীবন কীভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল, লেখক তাহাই আশ্চর্য রোমান্টিক অনুভূতি ও সূক্ষ্ম চরিত্রচিত্রণের দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। 'আনন্দ-মঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণীতে' যথাক্রমে দেশাত্মবোধ ও গীতার নিষ্কামতত্ত্বের প্রভাব দেখা যায়। সুবিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি 'আনন্দমঠে'র জন্য রচিত হইয়াছিল।

তাঁহার গার্হস্থ্য ও সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই পর্বের উপন্যাসে প্রাচীন ইতিহাস ও কাল্পনিক রোমান্স ত্যাগ করিয়া বাস্তব পরিবেশে নামিয়া আসিয়াছেন এবং আমাদের দেশের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের প্রধান সমস্যার উপর আলোকপাত করিয়াছেন। পুরুষের অসংযম ও নারীর চরিত্রগত দুর্বলতার ফলে কীভাবে মানুষ নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনে তাহার মর্মন্তুদ কাহিনী 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বর্ণিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত উপন্যাসে সর্বপ্রথম চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব চিত্রিত হইয়াছে। কাহিনী, চরিত্র, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিচার করিলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কেই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিতে হইবে।

আধুনিক কালের কোন কোন সমালোচক বলিতেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র

নীতিবাদ ও হিন্দু-মনোভাবের দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপন্যাসের বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষে'র কুন্দনন্দিনী এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর মৃত্যু উপন্যাসের প্রয়োজনে ঘটে নাই—লেখক, বালবিধবার পুনর্বিবাহের আসক্তি কিরূপে ব্যর্থ হয়, তাহাই যেন ঘোষণা করিতে চাহিয়াছেন। এই অভিযোগ নিতান্ত অমূলক নহে। বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শবাদী ঔপন্যাসিক ছিলেন। সে আদর্শ হইতেছে হিন্দুধর্ম ও সমাজের চরিত্রাদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগমানস ও সামাজিক আবহাওয়া বিচার করিলে এই আদর্শের প্রতি অত্যধিক অনুরক্তি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে না। সেই যুগের একমাত্র ফরাসী উপন্যাস ছাড়িয়া দিলে য়ুরোপের অন্যান্য দেশের উপন্যাসে আদর্শবাদই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সে যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র শুষ্ক নীতিকথাকে উপন্যাসে ঠাঁই দেন নাই; মানুষের যে চারিত্রনীতি বৃহৎ মানবনীতির পরিপন্থী নহে, তিনি সেই নীতিকেই স্বীকার করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮—১৯০৯) ॥

প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান এবং ভারত-ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের একনিষ্ঠ গবেষক, স্বদেশের হিতব্রতী রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা ও ইংরাজীতে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া মননশীল রচনাকাররূপে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই রমেশচন্দ্রকে বাংলা গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেন। বঙ্কিম দেখিলেন যে, এই প্রতিভাবান যুবকের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাই তিনি একদিন রমেশচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?" রমেশচন্দ্র কিছু সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর দিলেন, "আমি যে বাঙ্গালা লেখা কিছুই জানি না।...... ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই; কখনও বাঙ্গালা রচনাপদ্ধতি জানি না।" তৎসত্ত্বেও বঙ্কিম উৎসাহ দিয়া বলিলেন, "রচনাপদ্ধতি আবার কি? তোমরা

শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনাপদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।" তাঁহার উৎসাহে রমেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হইলেন। ইহার ফলে তাঁহার দুইখানি কল্পনাপ্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাস (বঙ্গবিজেতা—১৮৭৪; মাধবীকঙ্কণ—১৮৭৭) দুইখানি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস (জীবনপ্রভাত—১৮৭৮; জীবনসন্ধ্যা—১৮৮৯) এবং দুইখানি সামাজিক উপন্যাস (সংসার—১৮৮৬; সমাজ—১৮৯৪)—মোট ছয়খানি উপন্যাস রচিত হয়। প্রথম চারখানি উপন্যাসে মুঘলযুগের একশত বৎসরের ইতিহাস পটভূমিকা স্বরূপ ব্যবহৃত বলিয়া ইহারা একত্রে "শতবর্ষ" নামে পরিচিত। 'মাধবীকঙ্কণ' ও 'বঙ্গবিজেতা' ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত হইলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। কারণ ইহার প্রধান কাহিনী ও চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক ও ছদ্ম-ঐতিহাসিক উপন্যাস (Pseudo-Historical Novel) রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইখানি উপন্যাসে ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয় নাই; রচনারীতি, আখ্যান ও চরিত্র-চিত্রণে পরিপক্ক শিল্পবোধের অভাব আছে। তবে লেখক ইতিহাসের বর্ণনায় অনেকটা সফল হইয়াছেন। তাঁহার অপর দুইখানি উপন্যাস 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবন সন্ধ্যা'র প্রথমটিতে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাশক্তির উত্থান এবং দ্বিতীয়টিতে রাজপুতশক্তির অবসান বর্ণিত হইয়াছে। রমেশচন্দ্র আবাল্য ইতিহাসের সতর্ক পাঠক ছিলেন। এই উপন্যাস দুইটিতে ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান রাজশক্তির দেশপ্রেম, উত্থান ও পতন বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাসে তাঁহার যে বিপুল অভিজ্ঞতা ছিল, দুইটি উপন্যাসেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইহাদের কাহিনী ও প্রধান চরিত্র—সমস্তই ঐতিহাসিক। 'জীবন প্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা' বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া পরিচিত।

কোন কোন সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সবদিক দিয়া বিচার করিলে

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োজনস্থলে ইতিহাসকে কোথাও পরিবর্তিত, কোথাও-বা বিকৃত করিয়াছেন। কিন্তু রমেশচন্দ্রের মধ্যে সে দোষ নাই। কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যথাযথ ইতিহাস-বিবৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ নয়। ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে যদি একটা বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের বাণীবাহকরূপে ফুটাইয়া তোলা যায়, তবেই ঐতিহাসিক উপন্যাস সার্থক হয়। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন; রমেশচন্দ্র ইহার নিকটেও পৌঁছাইতে পারেন নাই। তাঁহার সে প্রতিভাই ছিল না। কাজেই তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় আকার, আয়তন ও আয়োজনে কৃপণতা না করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রশংসনীয় ঔপন্যাসিকের খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার দুইখানি সামাজিক উপন্যাস 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র শুধু যে ইতিহাস অবলম্বনেই উপন্যাস লিখিয়াছিলেন তাহা নহে। বাস্তবজীবন সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই উপন্যাস দুইটি। 'সংসারে' বিধবা বিবাহ এবং 'সমাজে' অসবর্ণ বিবাহ সমর্থিত হইয়াছে। এবিষয়ে তাঁহার মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রের মত রক্ষণশীল ছিল না। তিনি হিন্দু সমাজের আধুনিক পরিবর্তনে বিশ্বাস করিতেন। এই উপন্যাস দুইটিতে তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার তত্ত্বকথা ছাড়িয়া দিলেও রাঢ়ের এরূপ নিপুণ পল্লীচিত্র সমসাময়িক কোন উপন্যাসেই পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের পূর্বে বাঙলার আর কোন ঔপন্যাসিক এরূপ বিতর্কসঙ্কুল ব্যাপারকে সমর্থন করিয়া উপন্যাস লিখিতে সাহসী হন নাই। অবশ্য উপন্যাস হিসাবে এই দুইটি কাহিনী বিশেষ সার্থক হইতে পারে নাই। ইহাতে গল্পটি সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে মাত্র; ইহারা প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস হইয়া উঠিতে পারে নাই। সহানুভূতিশীল রমেশচন্দ্র বাঙলার সামাজিক সমস্যাকে উদার মনোভাবের

সাহায্যে সমর্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঘটনা ও চরিত্রকে সার্থক উপন্যাসের অভিমুখে চালনা করিতে পারেন নাই। তবু তাঁহার উপন্যাসে গল্পরসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আছে এবং চরিত্রগুলি বাস্তবধর্মী বলিয়া বঙ্কিমযুগেও তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩—১৯৩২)॥

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের দুই দীপ্ত তারকার মধ্যে অবস্থান করিয়াও শুধু প্রসন্ন উদারতা ও রমণীয় রচনার গুণে প্রভাতকুমার স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীরণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, তখন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি বাঙলার রসিকমহলে অতিশয় সমাদর লাভ করিয়াছে, বিদেশেও তাঁহার খ্যাতি ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও যে জনপ্রিয়তা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। সর্বোপরি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুদূর প্রবাস হইতে কলিকাতায় আসিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের উপন্যাস লিখিলেন এবং বাঙলার সাহিত্যসমাজে প্রবল আলোড়ন তুলিলেন। এইরূপ পরিবেশ সত্ত্বেও অসংখ্য গল্প ও কয়েকখানা মোটা মোটা উপন্যাস লিখিয়া প্রভাতকুমার পাঠকসমাজের প্রশংসা অর্জন করেন; সুতরাং তাঁহার প্রতিভার যে একটা সর্বজনীন আবেদন ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রভাতকুমার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি কিছু কিছু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু গদ্য, বিশেষতঃ কথাসাহিত্যই যে তাঁহার প্রধান বিচরণক্ষেত্র, তাহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সর্বপ্রথম দেখাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে এবং উপদেশে প্রভাতকুমার গল্প-উপন্যাস রচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছোট-গল্পের

কথা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে উপন্যাস সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা যাইতেছে।

প্রভাতকুমারের মোট উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দ।[২] তন্মধ্যে 'রমাসুন্দরী' (১৯০৮), 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদ্বীপ' (১৯১৫), 'সিন্দূর কৌটা' (১৯১৯), 'মনের মানুষ' (১৯২২) প্রভৃতি উপন্যাস একদা বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। প্রভাতকুমারের উপন্যাসে পল্লীজীবন, নাগরিক জীবন, একান্নবর্তী পরিবার, বিরহ-মিলনের স্নিগ্ধ-মধুর বর্ণনা, বাৎসল্যরস এবং জীবন সম্বন্ধে লেখকের প্রসন্ন মাধুর্য সেযুগের পাঠকের মন হরণ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীগত ঠাস বুনানি ও রোমাণ্টিক কল্পনার দিগন্তপ্রসারিত বিস্তার, রবীন্দ্রনাথের আত্মস্থ উপলব্ধির অতল অপার রহস্য, শরৎচন্দ্রের মানবজীবনের প্রতি তীব্র সহানুভূতি—এ সমস্ত প্রভাতকুমারের উপন্যাসে ততটা পাওয়া যাইবে না। জীবনসম্বন্ধে কোন উৎকট প্রশ্ন ও সমাজ সম্বন্ধে কোন বিতর্কসঙ্কুল সমস্যা তাঁহার চিত্তে ঠাঁই পায় নাই। তিনি যেন উপন্যাস-গুলিতে কতকগুলি হাল্কা ধরণের রেখাচিত্র আঁকিয়াছেন; তাহাতে চিত্র-শিল্পীর বর্ণবিলাস যেমন অল্প, তেমনি আলোক-চিত্রের আলো-আঁধারের লীলাও খুব গাঢ় নহে। তিনি বাস্তব বাঙলাদেশকে অবলম্বন করিয়া একটা প্রেম-প্রীতির জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন,—যেখানে যে কোন ঘটনাই অবলীলাক্রমে ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার বর্ণনাভঙ্গিমা এমন স্বচ্ছ ও বেগবান যে, পাঠক এই সমস্ত ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হইবারই সুযোগ পায় না। এক নিঃশ্বাসে উপন্যাস শেষ করিবার পর হয়ত সে পঠিত গ্রন্থের গুণাগুণ ভাবিতে বসে। যাহাতে তত্ত্ব নাই, তর্ক নাই, বিরহের হাহাকার

২ রমাসুন্দরী (১৯০৮), নবীন সন্ন্যাসী (১৯১২), রত্নদ্বীপ (১৯১৫), জীবনের মূল্য (১৯১৭), সিন্দূর কৌটা (১৯১৯), মনের মানুষ (১৯২২), আরতি (১৯২৪), সত্যবালা (১৯২৫), সুখের মিলন (১৯২৭), সতীর পাত (১৯২৮), প্রতিমা (১৯২৮), গরীব স্বামী (১৯৩০), নবদুর্গা (১৯৩০), বিদায় বাণী (১৯৩৩)।

নাই, মিলনের উল্লাস নাই, বিরাট আদর্শ নাই, ঘৃণ্য নীচতাও নাই—এমন কাহিনী সাধারণ পাঠকের কাছে চিরকালই প্রীতিপ্রদ হয়। সেইজন্য প্রভাতকুমারের উপন্যাস উচ্চশ্রেণীর না হইলেও সুখপাঠ্য বলিয়া সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট অকর্ষণীয় হইয়াছে।

ছোটগল্প

বাংলা নাটক ও উপন্যাসের মত ছোটগল্প পাশ্চাত্ত্য প্রভাবেই জন্মলাভ করিয়াছে। অবশ্য পশ্চিমেও ছোটগল্প খুব বেশী পুরাতন নহে। এক শতাব্দী পূর্বেও ওদেশের লেখক ও সমালোচকগণ ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও রচনারীতি লইয়া কলহ করিয়াছেন। বহু প্রাচীনকাল হইতে মানুষ গল্প বলিয়াছে, শুনিয়াছে—কিছু কিছু গল্প লেখাও হইয়াছে। সংস্কৃত, লাতিন ও ইতালীয় সাহিত্যে খুব প্রাচীনকালেও গল্প-কাহিনী লেখা হইয়াছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আখ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আধুনিক কালে যাহাকে ছোটগল্প বলে তাহা এযুগের ব্যাপার। অনেকের ধারণা ছোটগল্প ও উপন্যাস একই বস্তু; গল্পকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বড় করিলে উপন্যাস হয় এবং উপন্যাসের ডালপালা ছাঁটিয়া ছোট করিয়া দিলে ছোটগল্প হয়। এ মত একেবারে ভ্রান্ত। ছোটগল্প ও উপন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের বস্তু। উভয়ই মানব-জীবনের গল্প এবং উভয়ই গদ্যে রচিত হয়—এইটুকু মাত্র সাদৃশ্য। মহাকাব্যের সঙ্গে গীতিকাব্যের যে সম্পর্ক, উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের সম্পর্কটা কতকটা সেই জাতীয়। উপন্যাসে মানব-জীবনের দীর্ঘ জটিল কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়; তাহার অসংখ্য গলিঘুঁজি, নানা শাখা-প্রশাখা, বিপুল বিস্তার। অপরদিকে ছোটগল্পে বাহুল্যবর্জিত জীবনের একাংশ অতিশয় স্বল্পায়তনের মধ্যে চকিতে ফুটিয়া ওঠে। তাই ছোটগল্পের বিষয়বস্তু জটিল, মিশ্র বা দীর্ঘায়ত হইবার উপায় নাই। ইহাতে একটি মুহূর্তে একটি

জীবনের একাংশ মাত্র বিদ্যুতের মত ঝলসিত হইয়া ওঠে। অন্ধকার ঘরের ছিদ্রপথে আলোক প্রবেশ করিলে ঘরটার সামান্যতম স্থান আলোকিত হয়, সমস্ত ঘরখানা অন্ধকারে ঢাকা থাকে। ছোটগল্পেও ঐ একটি বিন্দুই আলোকিত হয়, বাকী অংশ অনুদ্‌ঘাটিত থাকিয়া যায়। তাই ইহাতে নাটকীয় ঘটনার আকস্মিকতা, গীতিকবিতার ব্যক্তিগতভাব এবং সাঙ্কেতিকতার ব্যঞ্জনা—এই তিনটি কৌশল বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

গীতিকবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের নিবিড় সম্পর্ক। গীতিকবি যেমন জগৎ ও জীবনকে নিজের অন্তরে প্রতিফলিত করিয়া বিশ্বের একটা ব্যক্তিভাব-রঞ্জিত (Subjective) মূর্তি ফুটাইয়া তোলেন, তেমনি ছোটগল্পের লেখকও সমস্ত কিছুকে তাঁহার ব্যক্তিগত মনের মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া নিজের ধারণাটিকেই (Impression) রূপায়িত করেন। তাই কেহ কেহ বলেন, উপন্যাস বক্তব্যপ্রধান (Objective), আর ছোটগল্প লেখকপ্রধান (Subjective)। পাশ্চাত্যদেশে আজকাল এত অদ্ভুত ধরণের ছোটগল্প রচিত হইতেছে যে, হয়তো কালক্রমে ছোটগল্প ও লিরিক কবিতা একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যাইবে। কাহারও কাহারও মতে আধুনিক কালে মানুষের জীবন এত কর্মমুখর হইয়া পড়িয়াছে যে, টলস্টয়ের '*War and Peace*'-এর মত বিরাট উপন্যাস পড়ার সময় কমিয়া যাইতেছে। এখন স্বল্প অবকাশে ছোটগল্প পড়িবারই যুগ; তাই পৃথিবীর সর্বত্র ছোটগল্প আর সকল সাহিত্য-শাখাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অবশ্য এ মত মানিয়া লইতে কাহারও কাহারও আপত্তি হইতে পারে। আধুনিক কাল যদি কেবল ছোটগল্পেরই যুগ হয়, তাহা হইলে এখনও য়ুরোপে বিশালকায় 'এপিক নভেল' রচিত হইতেছে কেন? সে যাহা হউক, আধুনিক কালে ছোটগল্পের যে অসম্ভব চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ, আবার তিনিই ছোটগল্পের রাজা। তাঁহার পূর্বে গল্পরচনার সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু

ছোটগল্প বলিতে যে বিশিষ্ট শিল্পপ্রকরণটিকে বুঝান হয়, তাহা তাঁহারই অবিস্মরণীয় কীর্তি। বঙ্কিমচন্দ্র বড়গল্পের আদর্শে 'রাধারাণী', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'ইন্দিরা' (প্রথম সংস্করণ লিখিয়াছিলেন। এগুলি উপন্যাসের মত বিস্তৃত নহে, আবার ছোটগল্পও নহে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র মধ্যে কোন কোন স্থানে ছোটগল্পের আঙ্গিক অনুসৃত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই শিল্পরীতি সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের কোন কোন আখ্যানে ছোটগল্পের রূপ ও রীতি ফুটিয়াছে। কিন্তু তিনিও সচেতনভাবে ছোটগল্প লেখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী একদা ছোটগল্প রচনা করিয়া পাঠকসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন গল্প ছোটগল্পের পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকালে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন গল্পলেখক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ত্রৈলোক্যনাথের অদ্ভুত গল্পগুলির সরস কৌতুকপ্রবণতা একযুগের পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছিল। তবে এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক প্রভাতকুমারের গল্পেই ছোটগল্পের রূপ, রীতি ও প্রকরণ সতর্কতার সঙ্গে অনুসৃত হইয়াছে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের উপদেশেই গল্প-উপন্যাস রচনায় ব্রতী হন। তাঁহার উপন্যাসের গুণাগুণ যেরূপ হোক না কেন, তাঁহার ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সৃষ্টি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কেহ কেহ তাঁহাকে বাঙলার 'মোপাসাঁ' বলিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্পলেখক গী দ্য মোপাসাঁ ও প্রভাতকুমারের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য নাই। মোপাসাঁর রচনাভঙ্গীর তীব্র, তীক্ষ্ণ, তির্যকতা এবং অসঙ্কোচ প্রকাশের দুর্নিবার সাহস প্রভাতকুমারের নাই। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মোপাসাঁর দার্শনিক প্রত্যয় ও জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিও প্রভাতকুমারের কৌতূহল নাই। তাঁহার হাল্কা সরসভঙ্গীতে বিবৃত

গল্প-কাহিনীর সঙ্গে মোপাসাঁর বাস্তবধর্মী উৎকৃষ্ট গল্পের সাদৃশ্য না থাকাই স্বাভাবিক। সে যাহা হউক, শতাধিক[১] গল্প লিখিয়া প্রভাতকুমার শ্রেষ্ঠ গল্পকারের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবেই পালন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গহনার বাক্স' (১৯২১) প্রভৃতি গল্পসঙ্কলন এক যুগের পাঠকের সুপরিচিত ছিল। প্রভাতকুমারের গল্পের মূলসুর তিনটি—বাঙালী মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি, শিক্ষিত যুবসমাজের বিড়ম্বনা এবং জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রীতিমধুর সম্পর্ক। তরল কৌতুকরস তাঁহার গল্পগুলিকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে। তাঁহার দুইটি প্রসিদ্ধ গল্প 'দেবী' ও 'রসময়ীর রসিকতা' দুই বিপরীত রস সৃষ্টিতে আশাতীতভাবে সফল হইয়াছে। 'দেবী' গল্পটি ব্যর্থ নারীজীবনের সকরুণ বেদনার উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং 'রসময়ীর রসিকতা' উদ্ভট ঘটনার কৌতুকরসে জীবন্ত। 'দেবী' গল্পের দয়াময়ী নাম্নী এক বালিকা-বধূর বিড়ম্বিত জীবনকথা আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। দয়াময়ীর কালীভক্ত শ্বশুর একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূ দয়াময়ীর দেহে কালিকা ভর করিয়াছেন। রাতারাতি বালিকাকে দেবীতে পরিণত করা হইল। দয়াময়ীর বধূজীবনের সেই মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি—মানবী ও দেবীর সংঘাত এবং পরিশেষে আত্মহত্যার দ্বারা দেবীজীবনের অবসান ও বধূজীবনের শোচনীয় পরিসমাপ্তি গল্পটিকে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে একটা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছে। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে আপাতঃ-ভৌতিক ব্যাপারের অবতারণা করিয়া কৌতুকরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে। রণরঙ্গিণী রসময়ী মরিয়াও স্বামীকে মুক্তি দিল না। তাহার মৃত্যুর পর পাছে স্বামী আবার বিবাহ করিয়া বসে, এই ভাবিয়া ভবিষ্যতের জন্য সে এক কৌশলের ব্যবস্থা করিয়া মরিয়া গেল। স্বামী বেচারী যেইমাত্র বিবাহে প্রস্তুত হইয়াছে, অমনি কোথা হইতে মৃত রসময়ীর হস্তাক্ষরযুক্ত একখানি

১ প্রভাতকুমারের গল্প-সঙ্কলনগুলিতে প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা—মোট ১১৪।

করিয়া ভৌতিক পত্র হাজির হইয়া স্বামীকে সাবধান করিয়া দিয়াছে। রসময়ী মরিবার সময় ভাবী ঘটনা অনুমান করিয়া কতকগুলি পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণ চিঠি লিখিয়া এমন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিল যে, স্বামী পুনর্বিবাহে প্রস্তুত হইলেই একখানি করিয়া চিঠি হাজির হইত। ভৌতিক চিঠির আসল রহস্য এমনি এক কৌতুকপূর্ণ কৌশলের মধ্যে নিহিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অবশ্য প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে আশা করা যায় না; কিন্তু পরিমিত ক্ষেত্রে তাঁহার গল্পগুলি পরম উপভোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রভাতকুমারের পরে বাংলা ছোটগল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প একটা প্রধান শাখারূপে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে।

॥ অনুশীলন ॥

১। উপন্যাস কাহাকে বলে? পৃথিবীতে উপন্যাসের আবির্ভাব কেমন করিয়া হইল?

২। ছোটগল্প কাহাকে বলে? ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের যে সূচনা হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের স্থান নির্ণয় কর।

৪। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক অবদান সম্বন্ধে কি জান? তাঁহার উপন্যাসগুলির প্রকৃতি অনুযায়ী একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৫। 'কপালকুণ্ডলা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব নির্ণয় কর। বঙ্কিম-উপন্যাসের আদর্শবাদ উপন্যাসের শিল্পকলাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে কি ?

৬। ঐতিহাসিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র—কাহার কৃতিত্ব সমধিক ?

৭। রমেশচন্দ্র তদানীন্তন সমাজসমস্যাকেও উপন্যাসে স্থান দিয়াছিলেন।—এবিষয়ে তোমার মতামত দাও।

৮। ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার উপন্যাস-রচনাকার রূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন কি ?

৯। বাংলা ছোটগল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর। প্রভাতকুমারের ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি জান ? তাঁহার যে-কোন দুইটি ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

অষ্টম অধ্যায়

কাব্য

সূচনা ॥

বাঙলাদেশে আধুনিক যুগ মধুসূদনের দ্বারা ত্বরান্বিত হইলেও কিছু পূর্ব হইতেই তাহার সূচনা হইয়াছিল। কবি ঈশ্বর গুপ্ত মধুসূদনের পূর্বে বাংলা কাব্যসাহিত্যে একচ্ছত্র আধিপত্য করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল— সকলেই গুপ্তকবির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্ত কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিলেও রুচি ও রচনার দিক হইতে প্রাচীনতার সঙ্গেই তাঁহার মিতালি হইয়াছিল। রঙ্গরস ও হাস্যপরিহাস ছিল তাঁহার কবিতার প্রধান অবলম্বন। তাঁহার শিষ্যস্থানীয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকাব্যে সর্বপ্রথম আধুনিকতার আমদানি করিয়াছিলেন। তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'শূরসুন্দরী', 'কাঞ্চীকাবেরী', 'কর্মদেবী' প্রভৃতি আখ্যানকাব্যে স্বাদেশিক মনোভাব, বীররস, ইতিহাসচেতনা প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তিনিই বাংলাকাব্যের পালা বদল করেন; স্কট, মূর প্রভৃতি কবিদের আদর্শে তিনি বৃহত্তর পটভূমিকায় বাংলাকাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। মধুসূদন ও রঙ্গলাল একে অপরের প্রতিবেশী ছিলেন; রঙ্গলালও মধুসূদনের মত ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু মধুসূদনের মত বিপ্লবী প্রতিভার অগ্নিবাণী তাঁহাকে ততটা উদ্বুদ্ধ করে নাই। তিনি পুরাতন পয়ারত্রিপদী ছন্দেই বীররসাত্মক আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ততলে নূতনের ইঙ্গিত ধ্বনিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা তিনি আয়ত্ত

করিতে পারেন নাই। এইস্থানে তাঁহার মৌলিক ত্রুটি। তবু তিনি বাংলা-কাব্যে নূতনত্বের সূচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ॥

ইতিপূর্বে আমরা মধুস্থদনের নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছি। কবি মধুস্থদনের প্রতিভা আরও অদ্ভুত। তাঁহার জীবনকথা বাঙলাদেশে সুপরিচিত। হিন্দু কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র মধুস্থদন দত্ত মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার নূতন নামকরণ হইল মাইকেল মধুস্থদন দত্ত। এই সংবাদে তদানীন্তন কলিকাতার সমাজে কিরূপ উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার পর পিতা বহুদিন তাঁহার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিলেও ধর্মত্যাগী পুত্রের প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। মধুস্থদন খ্রীষ্টান হইয়া দেশীয় সমাজ হইতেও বাহির হইয়া গেলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া তিনি মান্দ্রাজ যাত্রা করিলেন। সেখানে তিনি এক ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করেন, কিন্তু এ বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই; উভয়ের বিচ্ছেদ হইয়া যায়। তখন তিনি এক ফরাসী অধ্যাপকের আঁরিয়েত্তা (হেনরিয়টা) নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। আঁরিয়েত্তাই মধুস্থদনের সুখদুঃখের সঙ্গিনী। যাহা হউক দীর্ঘকাল পরে মধুস্থদন আঁরিয়েত্তাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন (১৮৫৬) এবং পুলিশকোর্টে দোভাষীর চাকুরী লইলেন। পরে ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে ব্যারিস্টার হইবার জন্য মধুস্থদন বিলাত যাত্রা করেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার প্রায় সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বিদেশে অর্থাভাবে তাঁহাকে নানা কষ্টের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহায্য প্রেরণ না করিলে কবিকে হয়তো ঋণের দায়ে বিদেশের

কারাগারে কয়েদ থাকিতে হইত। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে মধুসূদন ব্যারিস্টার হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আইনব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, কিন্তু অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া শেষজীবনে অর্থাভাবে এবং রোগেশোকে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে নিঃস্ব মধুসূদন রোগাক্রান্ত হইয়া আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন (২৬শে জুন)। ইহার কয়েকদিন পূর্বে তাঁহার সাধ্বী পত্নীও লোকান্তরিতা হন। মধুসূদন অর্থাভাবে কষ্ট পাইলেও তাঁহার বন্ধুগণ, বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তথাপি কপর্দকহীন অবস্থায় অনাত্মীয় পরিবেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ে মধুসূদনের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে—বাঙালীর এ কলঙ্ক কোন দিনই মুছিবে না।

মধুসূদন ছাত্রাবস্থায় অনেক ইংরাজী কবিতা লিখিয়াছিলেন। ইংরাজী-কাব্যে নাম রাখিয়া যাইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। মান্দ্রাজে বাস করিবার কালে ১৮৪৯ সালে তাঁহার *Captive Ladie* প্রকাশিত হয়। ইহাতে *Visions of the Past* সংযুক্ত হইয়াছিল। তিনি *Rizia* নামক একখানি ইংরাজী নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই। অতিশয় মেধাবী মধুসূদন অল্পদিনের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতীয়ের পক্ষে ইংরাজী সাহিত্যে পাড়ি জমান অসম্ভব। তখন তিনি বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হইলেন। কিছু পূর্বে তিনি নাট্যকার রূপে সংবর্ধিত হইয়াছিলেন। নাটকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া তিনি কাব্যরচনায় প্রস্তুত হইলেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, তিনি 'পদ্মাবতী' নাটকে সর্বপ্রথম 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' বা **Blank Verse** ব্যবহার করেন। চৌদ্দ মাত্রার পয়ারের অন্ত্যমিল তুলিয়া দিয়া ভাব অনুসারে যতি-সন্নিবেশ করার প্রকরণটি অমিত্রাক্ষর ছন্দ নামে পরিচিত। মাইকেল এই ছন্দের স্রষ্টা। তাঁহার পরবর্তী কাব্যে এই ছন্দ আরও মার্জিত হয়। এতদিনে আধুনিক বাংলা কাব্যের ভাষা সৃষ্টি হইল। তাঁহার পূর্বে পুরাতন ছন্দই কাব্যক্ষেত্রে আধিপত্য করিতেছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল - কেহই নূতন ছন্দ-রীতির উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিয়া বাংলা কাব্যের জড়তা দূর করিলেন—ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরগুপ্তের কালের দ্রুত অবসান হইল। ভাব, ভাষা ছন্দ ও বিষয়বস্তুর দিক হইতে মধুসূদনের বৈপ্লবিক অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যকে অভূতপূর্ব প্রাণরসে পূর্ণ করিয়া তুলিল।

মধুসূদনের কাব্যজীবন দীর্ঘবিস্তারী নহে। তাঁহার প্রথম কাব্য ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে এবং শেষ কাব্য ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে, মোট ছয় বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয়। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১ম খণ্ড—জানুয়ারী ১৮৬১, ২য় খণ্ড—১৮৬১), 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬),—ইহাই মধুসূদনের কাব্যসম্ভার। 'তিলোত্তমসম্ভব' কাব্যে তিনি সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। পুরাণের সুন্দ-উপসুন্দ ও তিলোত্তমার কাহিনী ইহার বর্ণনীয় বিষয়। এই কাব্যের ছন্দ ও শব্দবিন্যাসে কিছু কিছু ত্রুটি আছে, ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়া সর্বত্র মহাকাব্যের বিশালতা সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। মধুসূদনের প্রথম রচনা হইতে জড়তা দূর হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বাঙালীর পক্ষে এ কাব্য অভিনবত্বের বাণী বহন করিয়া আনিল। বিষয়বস্তুর দিক হইতে ততটা নহে, যতটা ইহার ছন্দের মৌলিকতায় বাঙালী বিস্মিত হইল। ইহার পরবর্তী রচনা 'মেঘনাদবধ কাব্য' এক মুহূর্তেই কবিকে অমরত্ব দান করিল। তাঁহার যৌবনকালের একমাত্র স্বপ্ন ছিল, তিনি বায়রনের মত কবি হইবেন। কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মধুসূদনের প্রতিভা বায়রন অপেক্ষা আরও গভীর ও সুদূরবিস্তারী; বরং মিল্টনের সঙ্গেই তাঁহার প্রতিভার তুলনা চলিতে পারে।

রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদের নিধনবর্ণনা এই মহাকাব্যের মূল বিষয়। অবশ্য ইহাতে মেঘনাদ অপেক্ষা রাবণ-চরিত্রই

অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। বীর রাবণের পুত্রশোকাতুর আর্ত বিলাপ এবং তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এই মহাকাব্যকে একাধারে মহাকাব্য ও ট্রাজেডিতে পরিণত করিয়াছে। ছন্দ, শব্দ, ভাব, ভাষা, আলঙ্কারিক মণ্ডনকলা,—সর্বোপরি বিপ্লবী জীবনাদর্শের অকুণ্ঠ ঘোষণায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' শুধু বাংলা সাহিত্যে নহে, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই এক অভিনব সৃষ্টি।

মধুসূদন বাল্মীকির রামায়ণ হইতে এই কাব্যের আখ্যান গ্রহণ করিলেও চরিত্রবিন্যাস ও কাহিনীগ্রন্থনে তিনি নিজস্ব ধ্যান-ধারণার দ্বারা অধিকতর পরিচালিত হইয়াছেন এবং ভারতীয় কাব্যাদর্শকে অনুসরণ না করিয়া পাশ্চাত্য মহাকাব্য ও শিল্প-রীতিকেই বরণ করিয়াছেন। এই কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যেও তাঁহার বিপ্লবী মনের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ধর্মাধর্ম অপেক্ষা মানবজীবনের বাধাবন্ধহীন উদ্দামতাকেই তিনি অধিকতর শ্রদ্ধা করিয়াছেন। তাই এই কাব্যে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী রামচন্দ্রকে ভক্তির বিল্বদলে পূজা না করিয়া রাবণ, মেঘনাদ ও প্রমীলাকে বৃহত্তর জীবনাদর্শের পটভূমিকায় স্থাপন করা হইয়াছে। সে যুগের প্রাচীনপন্থী বাঙালীসমাজ এই অভিনবত্বে শঙ্কিত হইয়াছিল। আর্য মহাকবির রামায়ণের আদর্শ ত্যাগ করিয়া রাবণকে শ্রদ্ধান্বিত মহিমার মধ্যে স্থাপন করিয়া মধুসূদন হিন্দুর আদর্শ নষ্ট করিয়াছেন—এই বলিযা সেযুগের রক্ষণশীল পাঠকসম্প্রদায় উচ্চ কলরব তুলিয়াছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই রসিক পাঠকগণ বুঝিলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জীবনের পটভূমিকায় 'মেঘনাদ-বধে'র মত কাব্য সৃষ্টি না হইয়াই পারে না। সর্বংসহা সীতার জন্ম হইয়াছিল ধরিত্রী হইতে; আর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র জন্ম হইয়াছে ১৯শ শতাব্দীর বাঙালী-মানসের বহ্নিকুণ্ড হইতে। ইহার ভাষা, শব্দপ্রয়োগ ও অলঙ্কার-সন্নিবেশে যৎসামান্য ত্রুটি আছে বটে, কিন্তু গুণ ও গৌরব এত বেশী যে, সে সমস্ত সামান্য ব্যাকরণভ্রান্তি পাঠকের মনেই থাকে না। ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর নবজাগরণ বুঝিতে হইলে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র তাৎপর্য বুঝিতে

হইবে। মধুস্থদনের পরে আরও অনেকে পাজি-পুঁথি মিলাইয়া ব্যাকরণ অলঙ্কারশাস্ত্র ঘাঁটিয়া বিশুদ্ধতর মহাকাব্য সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মেঘনাদবধের সমকক্ষ একখানা মহাকাব্যও রচিত হয় নাই।

মধুস্থদনের এমন অদ্ভুত প্রতিভা ছিল যে, একই সময়ে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুইখানি কাব্য লিখিতে পারিতেন। 'মেঘনাদবধের' প্রচণ্ডতা এবং 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র স্নিগ্ধ মাধুরী যে একই সময়ে একই কবির লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে তাহা সহসা বিশ্বাস হয় না। মধুস্থদন খ্রীষ্টান হইলেও হিন্দুমনোভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ পুরাণ ও মহাকাব্যকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তখন শিক্ষিত মহলে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া কাব্য রচনা করা কেহ কল্পনাই করিতে পারিত না। কিন্তু মধুস্থদন বৈষ্ণব কবিতার আদর্শে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনা করিলেন। ছোট ছোট কবিতায় কোমল স্নিগ্ধ ভাষায় রাধার সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনা চিত্রিত করিয়া কবি আর একপ্রকার প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বের সুগভীর আধ্যাত্মিকতা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' নাই; ভাষার মধ্যেও অপার্থিব ব্যঞ্জনার কিছু অভাব আছে। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের রাধা মধুস্থদনের হাতে পড়িয়া মানবী হইয়া উঠিয়াছেন। যুগধর্ম বিচার করিলে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে। তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও প্রাচীন পুরাণ ও মহাকাব্যের স্ত্রীচরিত্রগুলিকে নূতনভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ওভিডিয়াস পাব্লিয়াস ন্যাসো (খ্রীঃ পূঃ ৪৩—খ্রীঃ ১৭ অব্দ) নামক এক প্রাচীন রোমক কবির *Heroides* নামক পত্র-কাব্যের আদর্শে মধুস্থদন প্রাচীন ভারতীয় নারীদের মনোভাব পত্রের সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সমস্ত চরিত্রেও পৌরাণিক বিষয়বস্তুর আধারে আধুনিক জীবনরস পরিবেশিত হইয়াছে। ইহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ জড়তাহীন, স্বচ্ছ ও সাবলীল। তাঁহার সর্বশেষ কবিতাগ্রন্থ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' পাশ্চাত্য সনেটের আদর্শে রচিত। চৌদ্দ পংক্তিতে

রচিত পাশ্চাত্য কবিতাকে সনেট বলে। এই সময়ে মধুসূদন য়ুরোপে নানা দুঃখ দুর্দশার মধ্যে বাস করিতেছিলেন। বিদেশে অবস্থান করিয়া স্বদেশের জন্য তাঁহার মন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সেই অনুভূতি এই চৌদ্দ পংক্তির কবিতাগুচ্ছে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পরে অনেক কবি বাংলা সনেট লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু মধুসূদনের সনেটের শ্রেষ্ঠত্ব এখনও স্বীকৃত হয়।

মাইকেল মধুসূদন অতি অল্পদিন বাংলাকাব্যে বিহার করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে নাই। উপরন্তু শেষ-জীবনে তাঁহাকে আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ ক্লেশে জর্জরিত হইতে হইয়াছিল। এইজন্য তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে পরিণতির কিঞ্চিৎ অভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি রহিয়া-বসিয়া অবসর অনুসারে কাব্য রচনা করিতে পারেন নাই, সংশোধন ও পরিমার্জনেরও বিশেষ অবকাশ পান নাই। মাত্র আটটি বৎসরের মধ্যে (১৮৫৯—১৮৬৬) তাঁহার যাবতীয় নাটক, প্রহসন ও কাব্য রচিত হইয়াছিল। জীবনে আর একটু শান্তি ও অবসর পাইলে মধুসূদনের প্রতিভা-বহ্নি হোমানলের মত জ্বলিয়া উঠিতে পারিত। গ্রীক উপাখ্যানে আছে, প্রমিথ্যুস নামক এক টিটান দেবরাজ জিউয়সের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বর্গ হইতে আগুন চুরি করিয়া আনিয়া হতভাগ্য মানুষকে দান করিয়াছিল। এই অপরাধে তাহাকে বন্দি-অবস্থায় জিউয়সের নিদারুণ অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমাদের মধুসূদন যেন সেই বন্দী প্রমিথ্যুস। নিজ জীবনে অসহ্য দুঃখ ও অপরিসীম দুর্গতি বহন করিয়া গৌড়জনের জন্য তিনি যে সুধা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, বাঙালীজাতি তাহা কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩)॥

মধুসূদনের পর যাঁহারা মহাকবি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত কবি হেমচন্দ্র। মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া তিনি

কাব্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, রূপককাব্য, খণ্ড কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা, অনুবাদ কবিতা—কবিতাব প্রায় সর্ববিভাগে তিনি অবাধবিচবণ করিয়াছেন। এই দিক দিয়া তিনি মধুস্দন অপেক্ষা বিচিত্রতর প্রতিভাব পবিচয় দিয়াছেন। অবশ্য গুণগত উৎকর্ষে তাঁহাব স্থান মধুস্দনের অনেক নিম্নে। হেমচন্দ্র শুধু কাব্য নহে, শেক্সপীয়রেব *Tempest* ('নলিনীবসন্ত') এবং *Romeo and Juliet* ('রোমিও-জুলিয়েত') বাংলায় অনুবাদ করিযাছিলেন। অনুবাদ যে সুখপাঠ্য হয নাই, তাহা স্বীকাব করিতে হইবে। বরং তিনি পোপ, ড্রাইডেন, লঙফেলো, কীটস্ প্রভৃতি ইংবাজ কবিদেব যে সমস্ত কবিতা অনুবাদ কবিয়াছিলেন, সেগুলি নিতান্ত মন্দ হয় নাই। তাঁহার 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১), 'বীরবাহু-কাব্য' (১৮৬৪), 'আশাকানন' (১৮৭৬), 'ছায়াময়ী' (১৮৮০), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) প্রভৃতি কাব্যে নানা বৈচিত্র্য পবিলক্ষিত হইলেও কবি-প্রতিভাব বিশেষ চিহ্ন নাই। 'দশমহাবিদ্যার' রূপক কাব্য হিসাবে কিছু মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। হেমচন্দ্র যে সমস্ত গীতিকবিতা ও ব্যঙ্গ-কবিতা লিখিয়াছিলেন (কবিতাবলী, ১ম খণ্ড—১৮৭০, ২য় খণ্ড—১৮৮০), তাহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইংবাজী ধরনের আধুনিক গীতিকবিতার আদর্শে হেমচন্দ্র বাংলা গীতিকবিতাকে জনপ্রিয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইবে 'বৃত্রসংহার কাব্যে' (১ম খণ্ড—১৮৭৫, ২য় খণ্ড—১৮৭৭)।

হেমচন্দ্র মধুস্দনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনা করিতে গিয়া লক্ষ্য করেন যে, উহার ছন্দ, অলঙ্কার ও ব্যাকরণের কিছু কিছু ত্রুটি আছে। তখন তিনি পৌরাণিক বৃত্রাসুরের নিধনকাহিনী অবলম্বনে বিশুদ্ধতর মহাকাব্য রচনার প্রয়াস করিলেন। বৃত্রাসুর শিব-বরে উদ্ধত হইয়া দেবতাদিগকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজেই স্বর্গের 'ইন্দ্র' হইয়া বসিল। দেবতারা বহু কৃচ্ছ্র সাধনা করিয়া বৃত্রনিধনের উপায় বাহির করিলেন। তাঁহারা জানিতে

পারিলেন যে, পুণ্যবান দধীচি ঋষির অস্থিখণ্ড হইতে বজ্র নির্মিত হইলে তাহার দ্বারা বৃত্র নিহত হইবে। দধীচি দেবগণের কল্যাণে হৃষ্টচিত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই বজ্রের দ্বারা ইন্দ্র উদ্ধত ও পররাজ্যলিপ্সু: দুরন্ত বৃত্রাসুরকে বধ করিলেন। পুরাণের এই ঘটনাটি কবি তাঁহার মহাকাব্যে বর্ণনা করিলেন। 'বৃত্রসংহারে'র কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে মহাকাব্যের বিশালতা যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু কবি হেমচন্দ্র মধুসূদনের দ্বারা এত প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, প্রায় কোথাও প্রশংসনীয় মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ চরিত্রচিত্রণে তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে পদে পদে অনুসরণ করিয়াছেন; চরিত্রগুলির সঙ্গতিও সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। ভাষা ও ছন্দে, বিশেষতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও বজ্রনির্ঘোষ হেমচন্দ্রের কানে ধরা পড়ে নাই। 'বৃত্রসংহার' আকারের দিক দিয়া মহাকাব্যের অনুরূপ হইলেও, সত্যকারের মহাকাব্যের বিশালতা ও মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। সেযুগের সাধারণ পাঠক মাইকেলকে ছাড়িয়া হেমচন্দ্রের অধিকতর গুণগান করিত। মধুসূদনের বৈপ্লবিক প্রতিভার অভিনবত্ব যাহারা সহিতে পারিত না, তাহারা হেমচন্দ্রের ঈষৎ মোটা হাতের রচনায় বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিত। অবশ্য 'বৃত্রসংহার' কাব্যে যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম বর্ণিত হইয়াছে, তৎকালীন সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে তাহার মূল্য স্বীকার করিতে হইবে।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) ॥

কবি নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্র অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। কবি হিসাবে তিনি হেমচন্দ্রের মতই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের অধিবাসী নবীনচন্দ্র শুধু নিজ প্রতিভার গুণে কলিকাতার সারস্বত সমাজে অসাধারণ প্রভাব অর্জন করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার কবিত্বশক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। কলেজে পড়িবার সময় হইতে কলিকাতায় তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি ছড়াইয়া

পড়ে। তাঁহার অনেকগুলি কাব্য[১] বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। তন্মধ্যে 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম-১৮৭১, ২য়-১৮৭৮), 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫) এবং 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস (১৮৯৬) বাঙলার পাঠকসমাজে সুপরিচিত। 'অবকাশরঞ্জিনী' বিভিন্ন সময়ে রচিত গীতিকবিতার সঙ্কলন। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য লিখিবার বিশেষ সামর্থ্য ছিল না বটে, কিন্তু গীতিকবিতায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি বড় বড় কাব্যে বৃথা হস্তক্ষেপ না করিয়া যদি অধিকসংখ্যক গীতিকবিতা লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্য লাভবান হইত। তাঁহার দুই-একটি গীতিকবিতায় প্রায় রবীন্দ্রনাথের মত প্রগাঢ় অনুভূতি ও রোমান্টিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায়। 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫ প্রকাশিত হইবার পর তিনি যেন রাতারাতি বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। সিরাজের পরাজয় ও হত্যাকে কেন্দ্র করিয়া ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই আখ্যানকাব্য রচিত হয়। ইহাতে রচনাগত পরিপক্কতার অভাব থাকিলেও কবির উচ্ছ্বসিত আবেগ পাঠকের মন জয় করিয়া লইয়াছিল। বিশেষতঃ ইহাতে যে স্বাদেশিক মনোভাব ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহার জন্য তিনি স্বদেশপ্রেমিক পাঠকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। অবশ্য ইহার রচনা-রীতি অত্যন্ত দুর্বল ; একমাত্র ক্লাইভ ভিন্ন আর কোন চরিত্রই সুচিত্রিত হয় নাই। কবি ঐতিহাসিক কাব্য লিখিতে বসিয়া বহুস্থলে ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছেন—কাব্যের দিক দিয়া যে-বিকৃতির কোন প্রয়োজন ছিল না। তাহা হইলেও ওজস্বিনী ভাষা ও উচ্ছ্বসিত আবেগের জন্য এই কাব্য তাঁহাকে অদ্ভুত খ্যাতি-প্রতিপত্তি দান করিয়াছিল। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাকে কর্মস্থলে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ম করিতেন।

---

১ নবীনচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থের তালিকা : অবকাশরঞ্জিনী (১ম—১৮৭১, ২য়—১৮৭৮), পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৫), ভারত-উচ্ছ্বাস (১৮৭৫), ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭), রঙ্গমতী (১৮৮০), রৈবতক (১৮৮৭), মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (১৮৮৯), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮৮৯), খৃষ্ট (১৮৯১), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), অমিতাভ (১৮৯৫), প্রভাস (১৮৯৬), অমৃতাভ (১৯০৯)।

এইরূপ রাজদ্রোহমূলক কাব্য লিখিবার অপরাধে তৎকালীন ইংরাজ সরকার কবিকে বিশেষভাবে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। যাহা হউক দেশবাসী তাঁহাকে যেরূপ সম্মান করিত তাহাতে তাঁহার আর কোন ক্ষোভ ছিল না।

নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬) —তিনখানি কাব্য একত্রে বাংলা সাহিত্যে 'ত্রয়ী' কাব্য নামে পরিচিত। এগুলির ঘটনার মধ্যে পারম্পর্য আছে বলিয়াই এই নাম দেওয়া হইয়াছে। পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইলেও ইহাদের কাহিনী, চরিত্র ও বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীর যোগাযোগ আছে। কবি এই তিনখানি কাব্যে মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণচরিত্রকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমটিতে কৃষ্ণের আদ্যলীলা, দ্বিতীয়টিতে মধ্যলীলা এবং তৃতীয়টিতে কৃষ্ণের জীবনাবসান বর্ণিত হইয়াছে। কাব্য তিনখানি একত্রে মহাকাব্য নামে চলিলেও ইহাদের মধ্যে মহাকাব্যের বিশেষ কোন লক্ষণ নাই। নবীনচন্দ্রের প্রতিভা মহাকবির অনুকূল নহে; গীতিকবিতার দিকেই তাঁহার অধিকতর প্রবণতা ছিল। মাইকেলের আদর্শে ও যুগপ্রভাবে তিনি মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে মহাকাব্যের বিশালতা ও গভীরতা নাই বলিলেই চলে। তবে পৌরাণিক আখ্যানকাব্য হিসাবে কাব্য তিনখানি, বিশেষতঃ 'রৈবতক' বেশ সুখপাঠ্য।

আরও একটি কারণে এই কাব্য তিনখানি বিশেষভাবে স্মরণীয়। নবীনচন্দ্র আধুনিক সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিচার করিতে গিয়াছিলেন। এই কাব্যের ঘটনাবস্তু মহাভারত ও পুরাণ হইতে গৃহীত হইলেও ইহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোভাব অধিকতর প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই কেহ কেহ ঈষৎ পরিহাস করিয়া এই কাব্যত্রয়কে "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" বলিয়াছেন। কথাটা পরিহাসের ছলে বলা হইলেও ইহার তাৎপর্য স্মরণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনাদর্শ কবিকে

যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 'ত্রয়ী' কাব্যে তাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫— ৮৯৪)॥

মধুসূদন যেমন বাংলাকাব্যে যুগান্তর সৃষ্টি করেন, ঠিক তেমনি বিহারীলাল চক্রবর্তীও আধুনিক বাংলাকাব্যের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎরূপে সম্মান পাইবার যোগ্য। কিন্তু তাহার প্রতিভা ও প্রভাব এত গোপনচারী এবং অলক্ষ্যগোচর যে, তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা না করিলে তাঁহার যথার্থ প্রতিভা ও মৌলিকতার বৈশিষ্ট্য হয়তো বাঙালী পাঠকের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, মধুসূদনের প্রভাবে ও আদর্শে ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতায়ার্ধে একাধিক মহাকাব্য পাঠকসমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। হেম-নবীনের না হয় কথঞ্চিৎ প্রতিভা ছিল; কিন্তু আর যাঁহারা মহাকাব্যের ভাঙাহাটে আসর জমাইতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই মহাকাব্য লিখিবার কিছুমাত্র যোগ্যতা ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহ, বীররসের কৃত্রিম আস্ফালন, গালভরা বাক্যবিন্যাস—এই সমস্ত গতানুগতিক ব্যাপার বাংলাকাব্যকে প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর আবির্ভাব। তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর ধরিলেন। এবার আর মহাকাব্যের ঘনঘটা হাঁকডাক নহে—বিহারীলাল গীতিকাব্য সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার মনের গভীরে যে সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রেমপ্রীতি, বিরহমিলনের তরঙ্গ উঠিতেছে, তিনি স্নিগ্ধ মধুর স্বরে সেই গোপন কথাটি বিবৃত করিলেন। তখন বাংলার পাঠকসম্প্রদায় মহাকাব্যের রসে মুগ্ধ হইয়াছিল; তাই তাহারা এই গীতিরসের (Lyric) তাৎপর্য ধরিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগুরু বিহারীলালের কবিত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহাকে 'ভোরের পাখী' বলিয়াছেন। ভোরের পাখী যেমন জগৎ জাগিবার পূর্বে কোন্ পত্রান্তরাল হইতে

ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিয়া প্রভাত সূচনা করে, ঠিক তেমনি বিহারীলালও আত্মভাবপ্রধান (subjective) গীতিকবিতা লিখিয়া পরবর্তি কালের ঐশ্বর্যময় গীতকবিতার যুগকে ত্বরান্বিত করিয়াছেন। তাহার পূর্বে বাঙলাদেশে যে গীতিকবিতার প্রচলন ছিল না তাহা নহে ; প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ চর্যাগীতিকা, মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী, বাউলসঙ্গীত, ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর টপ্পা, আগমনী-বিজয়া গান প্রভৃতিতে গীতিপ্রাণতার প্রভাব ছিল। বলিতে কি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে গীতিরসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তাই কাহারও কাহারও মতে গীতিকাব্যেই বাঙালীর যথার্থ পরিচয় ফুটিয়াছে। মধুসূদন ও তাঁহার শিষ্যেরা মহাকাব্যের সাহায্যে বাংলাকাব্যের গতি ভিন্ন দিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর শেষাংশে পৌছাইয়া দেখা গেল যে, মহাকাব্যের ধারা ক্রমে ক্রমে রসহীন হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার পাশে অন্য একটি ধারা অসাধারণ গতিবেগ অর্জন করিয়াছে। ইহা গীতিকাব্যের ধারা। বিহারীলাল এই আধুনিক ধারাটির সূচনা করেন, এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ (অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি) ইহার পরিপুষ্টি ও পূ·তা সাধন করেন। পরবর্তি কালে গীতিকবিতাই বাংলা কবিতার একমাত্র প্রতিভূ বলিয়া গৃহীত হইল। তাই বিহারীলালকে আধুনিক গীতিকবিতার গুরুস্থানীয় বলা চলিতে পারে। রবীন্দ্রনাথও প্রথম দিকে বিহারীলালকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আদর্শে কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বিহারীলাল কলিকাতার পুরাতন বাসিন্দা। তিনি সংস্কৃত কলেজে উত্তম রূপে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার বন্ধু, সে যুগের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সাহায্যে ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সহধর্মিণী কবিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার

ভক্তশিষ্য। রবীন্দ্রনাথের কন্যার সঙ্গে বিহারীলালের পুত্রের বিবাহ হইলে এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তায় পরিণত হয়।

বিহারীলাল ১৮৬২ সালের পূব হইতেই গীতিকবিতা রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'সঙ্গীত শতক' (১৮৬২), 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'প্রেমপ্রবাহিণী' (১৮৭০), 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) এবং 'সাধের আসন' (১৮৮৯-৯০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে 'সারদামঙ্গল' তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

তাঁহার কবিতার ব্যক্তিগত অনুভূতি পাঠকের প্রীতি ও বিস্ময় আকষণ করে। এতদিন সকলে সংস্কারের রঙিন চশমার মধ্য দিয়া জগৎ ও জীবনকে দেখিতেন। কিন্তু নির্জনতা-প্রিয় কবি বিহারীলাল সাদা চোখে, অন্তরের অনুরাগের মারফতে বিশ্বকে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই উপলব্ধিকে শিল্পরূপ দিয়া সার্থক গীতিকবিতা সৃষ্টি করিয়াছেন। এইস্থলে তাঁহার সঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, শেলী, কীটস্‌ প্রভৃতি ইংরাজ কবিদের গভীর সাদৃশ্য। প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য ও প্রেম—তাঁহার গীতি-প্রতিভা প্রধানতঃ এই তিনটি শাখাকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হইয়াছে। 'সারদামঙ্গলে' তিনি দেবী সরস্বতীকে বিশ্বমূলাধার সৌন্দর্যের অধীশ্বরী দেবী বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। এই সারদার সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত বিরহ-মিলনের অভিনব সম্পর্কই 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসনে' বিকশিত হইয়াছে। কেহ কেহ কবির সারদাতত্ত্বের পশ্চাতে শেলীর সৌন্দর্য-দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু কবির সারদা-প্রেম বিশেষ কোন পাশ্চাত্য প্রভাবে পরিকল্পিত হয় নাই; তাঁহার ব্যক্তিগত প্রেম ও সৌন্দর্যবিভোরতাই সারদাতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। সে যাহা হউক, বিহারীলাল আধুনিক বাংলাকাব্যকে অভিনব পথে প্রেরণ করিয়াছেন। গীতি-প্রবণতাই যে বাংলাকাব্যের প্রধান সুর, তাহা তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট হইল। পরবর্তি কালের বাংলাকাব্য তাঁহারই খনিত পথ

ধরিয়া যাত্রা করিয়াছে। তাই তাহাকে আধুনিক বাংলাকাব্যের গুরু বলিয়া গ্রহণ কবা অতিশয় যথার্থ।

অবশ্য বিহারীলাল যে পরিমাণে ভাবুক ছিলেন, সেই পরিমাণে সৃষ্টিশীল বচনাশক্তিব অধিকারী ছিলেন না। কিংবা হয়তো তন্ময় কবি রচনারীতি ও শিল্পপারিপাট্যেব দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। কারণ, তিনি তো পাঠকের নিকট বাহবা পাইবার জন্য কবিতা রচনা করেন নাই। আপন মনের আনন্দবেদনাব মাধুরীটুকু প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন; তাহা ছন্দে-অলঙ্কারে-ভাবে-ভাষায় একটি মার্জিত কবিতা হইতে পারিয়াছে কিনা সেদিকে তাহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত না। তিনি সবদা একটা ইন্দ্রিয়াতীত ভাবরসে (Mysti) নিমগ্ন থাকিতেন বলিয়া প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভা সত্ত্বেও তাহার কবিতাসমূহ অনেক সময় শিল্পমূর্তি গ্রহণ করিতে পারে নাই। শ্রেষ্ঠ কাব্য সৃষ্টিতে নহে, নূতন পথের দিশারীরূপেই বিহারীলাল বাংলা গীতিকাব্যের ইতিহাসে চিরস্মবণীয় হইযা থাকিবেন।

॥ অনুশীলন ॥

১। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলাকাব্যের প্রধান পার্থক্য কোথায়? মধুসূদনের পূর্বে কাহারা আধুনিকতার সূচনা করিয়াছিলেন?

২। মধুসূদনের বহুমুখী কবি-প্রতিভার পরিচয় দাও এবং ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশপদী কবিতাবলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। মধুসূদনকে মহাকবি বলা হয় কেন? মেঘনাদবধ কাব্যের অভিনবত্ব বিচার কর।

৪। হেমচন্দ্র মহাকবিরূপে কেন খ্যাত? তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের পরিচয় দাও। কেহ্ কেহ্ বলেন যে, তিনি মধুসূদনের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এবিষয়ে তোমার মতামত দাও।

৫। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতা সম্বন্ধে কি জান? মহাকাব্য ও গীতিকবিতা, কোন্‌টিতে তাঁহাদের প্রতিভা অধিকতর স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে?

৬। 'পলাশির যুদ্ধ' সম্বন্ধে কি জান? ইহাই কি নবীনচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা?

৭। ত্রয়ীকাব্য' কাহাকে বলে? নবীনচন্দ্র এই ত্রয়ীকাব্যে পুরাণ ও আধুনিকতার সঙ্গে মিল ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার কৃতিত্ব নির্ণয় কর।

৮। বিহারীলাল বাংলাকাব্যের গুরু বলিয়া পূজিত কেন? তাঁহাকে 'ভোরের পাখী' বলা হইয়াছে। ইহার কারণ কি?

৯। গীতিকবি হিসাবে বিহারীলালের শ্রেষ্ঠদান কি? 'সারদামঙ্গল' সম্বন্ধে কি জান?

নবম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)

জীবনকথা ॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ, শুধু বাংলা সাহিত্য নহে, সমগ্র প্রাচ্যদেশ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বসভায় বরণীয় করিয়াছেন। ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ প্রাচ্যদেশকে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করিত না। স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ব-পরিক্রমার পর তাহাদের মনে ভারতের প্রতি সর্বপ্রথম শ্রদ্ধা-সম্মানবোধ জাগ্রত হয়। এতদিন ধরিয়া তাহারা ভারতবর্ষকে বর্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছে এবং সেই সুযোগে এদেশে অব্যাহতভাবে ঔপনিবেশিক শোষণনীতি চালাইয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় স্বামীজীর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে পশ্চিমে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যুগসঞ্চিত ঘৃণা ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইয়া য়ুরোপের সাধারণ মানুষ আধুনিক ভারতবর্ষের প্রতিভা ও নব্য ভারতসংস্কৃতির অভিনব পরিচয় পাইল। ভারতের সংস্কৃতি-সাধনার প্রতীকরূপে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বে পূজিত হইয়া এই প্রাচীন দেশকে মহত্তর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি প্রধানতঃ বাংলাভাষার কবি বলিয়া বাংলাভাষা-ভাষী সকলেই চিরদিন গৌরব অনুভব করিবেন।

১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার জ্ঞানে-মানে-ধনে সারা ভারতেই বিখ্যাত হইয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীর যে সমস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাঙলাদেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার অধিকাংশের উৎসমূল—এই ঠাকুরবাড়ী। এই বিখ্যাত পরিবারে সন ১২৬৮ সালে ২৫এ বৈশাখ (ইংরাজী ১৮৬১ সাল, ৭ই মে)

রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির আধুনিক প্রতীক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্য ও কৈশোরে পিতৃদেবের পুণ্যপ্রভাবে আসিয়াছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ গৃহে উত্তম রূপে শিক্ষিত হইলেও স্কুল কলেজের বাঁধা-ধরা গণ্ডীর মধ্যে তিনি কোন দিনই মানসিক স্বস্তি বোধ করেন নাই। দশ-এগার বৎসর বয়সে তাঁহার কাব্যপ্রতিভার প্রথম উন্মেষ হয়। গৃহশিক্ষকের নির্দেশে তিনি বাল্যকালে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' এবং শেক্সপীয়ারের *Macbeth* নাটকের কিয়দংশ অনুবাদ করেন। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ' ১২৮১ সালের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স এগার বৎসরের কিছু বেশী। তিনি সাড়ে সতের বৎসর বয়সে বিলাত যাত্রা করেন। উত্তরকালে তিনি বহুবার য়ুরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূর প্রাচ্য প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিত্বখ্যাতিও বিস্তার লাভ করিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং আরও নানা প্রকার স্বাদেশিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার গভীর যোগাযোগ ছিল। কয়েকজন বন্ধু ও সহযোগীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালে বোলপুরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন। পরে ইহাকে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য তিনি ১৩২৫ সালে ৮ই পৌষ 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে গভীর-ভাবে জড়াইয়া পড়েন ; কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশঃ গোপনচারী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিতেছে, তখন তিনি এই আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শান্ত, নিরুত্তপ্ত কর্তব্যকর্মের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। 'গীতাঞ্জলির' ইংরাজী অনুবাদের জন্য সুইডিশ এ্যাকাডেমী তাঁহাকে য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার (তখন উহার মূল্য—৮,০০০ পাউণ্ড) দান করিলে দেশবিদেশে তাঁহার কবিখ্যাতি বিদ্যুদ্‌বেগে ছড়াইয়া পড়িল। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তিনি

সসম্মানে গৃহীত হইলেন। ইহার পর তিনি কয়েকবার পাশ্চাত্য জগৎ ও প্রাচ্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বের যেখানে গিয়াছেন, সেখানকার অধিবাসীরা তাঁহার রাজোচিত সংবর্ধনা করিয়াছে, অধীর আগ্রহে তাঁহার ভাষণ শুনিয়াছে এবং তাঁহাকে প্রাচ্যের দার্শনিক ও মহাপুরুষ বলিয়া প্রণাম করিয়াছে। তাঁহার অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখিয়া য়ুরোপের কোন কোন চতুর রাষ্ট্রনেতা তাঁহাকে নিজেদের প্রচার কার্যে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন দিন অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করেন নাই; তিনি সবিনয়ে ইঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদেশে তিনি সকলের গুরুদেব।

সে যুগে এদেশের কেহ কেহ তাঁহার বিরোধিতা করিলেও দেশবাসী তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিত।[১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৩ সালে তাঁহাকে 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ভারত সরকার ১৯১৫ সালে তাঁহাকে 'স্যর' উপাধি দান করেন। কিন্তু কবি ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরাজ সরকারের চণ্ডনীতির প্রতিবাদে এই 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করেন। তিনি ব্যঙ্গ করিয়া ইহাকে 'ছার' উপাধি বলিতেন।[২] ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডক্টর অব লিটারেচার (ডি লিট.) উপাধি দান করেন। কবি অসুস্থ ছিলেন বলিয়া উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইতে পারেন নাই। তদানীন্তন ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর মরিস গয়ার শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইয়া উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ লাতিন ভাষায় মুদ্রিত অভিনন্দন লিপি পাঠ করেন। কবিও

১ বাঙলার মনীষী ও দেশনেতারা মিলিত হইয়া কবির পঞ্চাশৎ ও সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দুইবার বিশেষ আড়ম্বরের সাহায্য তাঁহাকে সংবর্ধিত করেন।

২ 'ভানুসিংহের পত্রাবলীতে' রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেছি আমার ঐ 'ছার' পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। ...আমি লিখেছি বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল। তাই ভারের উপরে ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছিনে, তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।"

সংস্কৃতে তাহার যথাযোগ্য উত্তর দেন। তাঁহার জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি ত্রিপুরা রাজদরবার হইতে 'ভারতভাস্কর' উপাধি লাভ করেন (১৯৪১)। ইহাই তাঁহার শেষ উপাধি লাভ। ক্রমে তাঁহার শরীর অপটু হইয়া পড়িল; ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ তিনি শেষ জন্মোৎসবের ভাষণ দিলেন—'সভ্যতার সঙ্কট'। তখন য়ুরোপে যে সর্বনাশা মারণযজ্ঞ চলিতেছিল, তাহার ফলাফল ভাবিয়া কবি শঙ্কিত হইয়াছিলেন। এই বৎসর কবির জীবিতকালের শেষ কাব্য 'জন্মদিনে' (১৩৪৮, বৈশাখ) প্রকাশিত হইল। বিদায় লইবার পূর্বে কবিগুরু মহামানবের আহ্বান জানাইয়া শেষ গান রচনা করিলেন—"ঐ মহামানব আসে"। ১৯৪৮ সালের আষাঢ় মাসের দিকে তাঁহার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া পড়িল; সুচিকিৎসার জন্য শ্রাবণমাসের প্রথমে তাঁহাকে শান্তিনিকেতন হইতে জোড়াসাঁকোয় স্থানান্তরিত করা হইল। দেহে অস্ত্রোপচার সত্ত্বেও কবির জীবনরক্ষা হইল না। ১৩৪৮ সালের ২২এ শ্রাবণ (১৯৪১, ৭ই আগষ্ট) বেলা ১২-১০ মিনিটে আশী বৎসর বয়সে কবি তাঁহার পৈতৃক ভবনে জীবনলীলা সাঙ্গ করেন। তাঁহার তিরোধানে শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্তমিত হইল।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবন এমন সুগভীর ব্যাপক ও সুদূরবিস্তারী যে, স্বল্প পরিসরে তাহার কণামাত্র পরিচয়ও দেওয়া যায় না। যিনি ষাট বৎসরেরও অধিক কাল সরস্বতীর সেবা করিয়াছেন, তাঁহার সুদীর্ঘ সারস্বত সাধনা সমগ্র জীবন ধরিয়া অনুশীলনের বস্তু। যাহা হউক, এখানে শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ করা যাইতেছে।

কাব্য ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয়—তিনি কবি, বিশ্ব-কলাকারের বীণকার। দীর্ঘ কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া মানবসংস্কৃতি আজ যে পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, রবীন্দ্রকাব্যে সেই যুগ যুগান্তরের বাণী

বাঙ্ময় হইয়াছে। একদা একটি দ্বাদশ বর্ষের বালক 'অভিলাষ' নামক দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছিল। সেদিন কেহ অনুমানও করিতে পারে নাই যে, সেই অস্ফুট প্রতিভা কিরূপ ব্যাপকভাবে আপনাকে বিকীরিত করিয়া দিবে। বিরাট অক্ষয়বটের বীজটি অতিশয় ক্ষুদ্র।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের কাব্যধারা বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাঁহার প্রথম পরিপক্ক রচনা 'প্রভাত সঙ্গীতে'র (১৮৮৩) পূর্ববর্তী কোন কাব্য হইতেই বিহারীলালের প্রভাস হ্রাস পায় নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ উন্মেষ দেখা গেল 'প্রভাত সঙ্গীতে' এবং তাঁহর কবিমানস স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল 'মানসী' (১৮৯০) ও 'সোনার তরী'তে (১৮৯৪)। অন্তর্জগৎ ও বিশ্বজগতের সঙ্গে সম্পর্ক-নির্ণয় রবীন্দ্রকাব্যের একটা প্রধান সুর। ইহার সহিত অন্বিত হইয়াছে মর্ত্যপ্রেম। 'মানসী'তে রবীন্দ্রনাথ পুরাপুরি 'হৃদয়-অরণ্য' হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পাবেন নাই। 'সোনারতরী'তেই তিনি স্পষ্ট-রূপে জগৎ এবং আপনাকে উপলব্ধি করিলেন। 'চিত্রা' কাব্যে (১৮৯৬) তাঁহার অনুভূতি, প্রকাশ-শিল্প ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহা রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এই কাব্যে তিনি প্রকৃতি, বিশ্বজীবন, সৌন্দর্য, প্রেম এবং জীবনদেবতাকে আত্মার গভীরে উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) 'গীতিমাল্য' (১৯১৪), 'গীতালি' (১৯১৪), 'বলাকা' (১৯১৬)এবং 'পূরবী' (১৯২৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাব্য 'খেয়া'তে (১৯০৬) মর্ত্যজগতের অন্তরালবর্তী আরও একটা জগতের আহ্বান কবির প্রাণে আসিয়া পৌছাইল। 'গীতি'-আখ্য কাব্য তিনখানিতে সেই সুর স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইহাতে তিনি জীবনের অধীশ্বরকে কখনও প্রিয়রূপে, কখনও বন্ধুরূপে, কখনও জীবনদেবতারূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চেতনার স্বরূপ এবং অধ্যাত্ম সাধনার বৈশিষ্ট্য এই তিনখানি কাব্যে ধরা পড়িয়াছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপ এই 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ

পড়িয়া জীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা ফিরিয়া পাইয়াছিল। কিন্তু কবি বেশিদিন আত্মার গভীরে ডুব দিয়া ব্যক্তিচিত্তের লীলারসে তন্ময় হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন য়ুরোপে পুরাদমে যুদ্ধ চলিতেছে; পুরাতন জীর্ণতা ও বিগত-শতাব্দীকে ভাঙিয়া চূরিয়া য়ুরোপ তখন তীব্র বেগবান জীবনবোধের স্বপ্ন দেখিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে গিয়া সেই বাধাবন্ধহারা জীবনবেগ উপলব্ধি করিলেন। 'বলাকা'য় সেই বৃহৎ জীবনবোধের 'অকারণ অবারণ চলা' ফুটিয়া উঠিল। 'পূরবী' (১৯২৫) ও 'মহুয়া'য় (১৯২৯) তাঁহার প্রাণরসোজ্জ্বল যৌবনঋদ্ধ আবেগ আর এক রূপে প্রকাশিত হইল। ইহার পরে তিনি নানা কাব্যে ('পুনশ্চ'—১৯৩২, 'শেষসপ্তক'—১৯৩৫, 'পত্রপুট'—১৯৩৬, 'প্রান্তিক' ১৯৩৮, 'সেঁজুতি'—১৯৩৮, 'নবজাতক'—১৯৪০, 'জন্মদিনে'—১৯৪১ ইত্যাদি) জীবনের নানাসুরের ঐকতান তুলিয়াছেন। এই শেষপর্বের কাব্যে তিনি একদিকে মানুষের দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন, প্রত্যহের পরিচিত জগতের সুকঠোর তিক্ত রূপের পরিচয় পাইয়াছেন। তেমনি আবার অন্যদিকে ঔপনিষদিক আত্মোপলব্ধির গভীরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান সুর—মর্ত্যসৌন্দর্যের প্রতি আর্টিস্ট-সুলভ আকর্ষণ, জগতের বৃহৎ সত্তার উপলব্ধি, অধ্যাত্মচেতনার নিবিড় আসঙ্গ। তাঁহার কাব্যের রূপকল্প, বাঙ্‌নির্মিতি, মণ্ডনকলা, উপলব্ধির তীব্রতা ও গভীরতার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সমসাময়িক কালের অন্য কবির কাব্যে বিরল বলিলেই চলে। তাঁহার পূর্ববর্তি কালের মাত্র অল্প কয়েকজন কবি এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ। জার্মান মহাকবি গ্যয়ঠের (১৭৪৯-১৮৩২) সঙ্গে তাঁহার জীবন, শিল্প ও রস-সাধনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু দুইজনের প্রতিভার মধ্যে বৈষম্য আছে। গ্যয়ঠে প্রাকৃত জীবনের পঙ্কিলতায় ডুব দিয়া মূল্যবান রত্ন আহরণ করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের তাহাতে রুচি ছিল না। আবার রবীন্দ্রনাথের গভীর আত্মোপলব্ধি গ্যয়ঠের মধ্যে এতটা তীব্রভাবে ধরা দেয় নাই। যাহা হউক, ভারতের উপনিষদ, কালিদাস, বৈষ্ণব কবি, ইংলণ্ডের রোমান্টিক

পর্বের কবিগোষ্ঠী, ফরাসী সাঙ্কেতিক সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর মিতালি। কবি হিসাবে তাঁহার উপলব্ধি, রূপনির্মিতি, চৈতন্যের গভীর ব্যঞ্জনা অতীত যুগের কোন একজন কবির মধ্যে এত বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায় নাই, ভবিষ্যতেও তাঁহার সমকক্ষ ও সমান-ধর্মা কবির আবির্ভাব হইবে কিনা বলা যায় না।

নাটক ॥

নাটক একটা বস্তুগত মিশ্র ধরনের শিল্প। নাট্যকার শুধু নিজ কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিয়া নাটক লিখিতে পারেন না। নাট্যশিল্প কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাত ও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। কাজেই আত্মকেন্দ্রিক গীতিকবিরা প্রায়ই নাট্যরচনায় ততটা সফলকাম হন না। শেলী, কীট্‌স, ব্রাউনিং—ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিগণ নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু সেগুলি কাব্যলক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। তাই তাঁহাদের নাটক-নাটিকা নাট্যকাব্য নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের মত বিশুদ্ধ লীরিক কবি যদি নাটক রচনা করিতে যান, তবে তাঁহার অবস্থাও ঐরূপ হইবে—এই রূপ ধারণাই স্বাভাবিক। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলি উৎকৃষ্ট। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায়-অভিশাপ' (১৮৯৪), 'কাহিনী' (১৯০০) প্রভৃতি নাট্যকাব্যগুলি অতিশয় সুখপাঠ্য। ইহাতে বাহিরের ঘটনাসংঘাত অপেক্ষা কবির বিশেষ একটি আবেগধর্মী 'আইডিয়া' প্রাধান্য পাইয়াছে। গীতিকবির পক্ষে এই রূপ নাটক রচনাই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে সত্যকারের নাট্য-প্রতিভা ছিল, তাহার প্রমাণ মিলিবে 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) প্রভৃতি নাটকে। এই নাটকগুলিতে কবির নিজস্ব ধ্যানধারণা যে প্রাধান্য পায় নাই তাহা নহে। কিন্তু তিনি ইহাতে প্রধানতঃ নাট্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, কবির নহে। ডঃ এডোয়ার্ড টমসন নামক একজন রবীন্দ্রসমালোচক কবির নাটক-

প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমস্ত নাটক একটা ভাব বা তত্ত্বের বাহন; উহাতে ঘটনাগত সংঘাত বড় বেশী নাই। টমসন সাহেবের এ মন্তব্য খুব অযৌক্তিক নহে। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, শ্রেষ্ঠ নাটকে ঘটনা ও চারিত্রিক দ্বন্দ্বসংঘাতের সঙ্গে জীবনসম্বন্ধে নাট্যকারের একটা নিঃস্পৃহ 'আইডিয়া' প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিবেই। রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের নাটকে তত্ত্ববাদ প্রধান হইলেও নাট্যরস যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। এই সময়ে বাঙলার রঙ্গমঞ্চে ভক্তিরসের পৌরাণিক নাটক, বড় বড় গালভরা-উক্তিতে-স্ফীতকায় ঐতিহাসিক নাটক এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার লইয়া রচিত পারিবারিক নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। সেই সমস্ত নাটকের খানিকটা অভিনয়-যোগ্যতা থাকিলেও সাহিত্যগুণের দিক দিয়া এগুলি অত্যন্ত দুর্বল। রবীন্দ্রনাথের নাটকে অভিনয়যোগ্যতার সঙ্গে উচ্চতর ভাবাদর্শ ও সাহিত্যগুণ স্বীকৃত হইল।

তাঁহার প্রহসন ও রঙ্গনাট্যগুলি ('বৈকুণ্ঠের খাতা'—১৮৯৭, 'হাস্যকৌতুক' —১৯০৭, 'ব্যঙ্গ কৌতুক'—১৯০৭, 'চিরকুমার সভা'-১৯২৬, 'শেষরক্ষা'—১৯২৮, প্রভৃতি) নির্মল হাস্যপরিহাস ও প্রসন্নরুচিতে কৌতুক নাট্যের একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। অবশ্য তাঁহার রঙ্গনাট্যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে; শ্রেষ্ঠ কৌতুকনাট্যে চরিত্র ও ঘটনার অসঙ্গতিজনিত হাস্যই নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্যে ঘটনার বৈচিত্র্য অপেক্ষা চরিত্র সমূহের সংলাপের চতুরতা ও পরিহাস অধিকতর উপভোগ্য। তাঁহার 'শেষরক্ষা' ও 'চিরকুমার সভা' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রঙ্গনাট্য। এই সমস্ত নাটক ছাড়াও তাঁহার গীতিনাট্য ('বাল্মীকি-প্রতিভা'—১৮৮১, 'মায়ার খেলা'—১৮৮৮) এবং নৃত্যনাট্য ('চণ্ডালিকা'—১৯৩৮, 'চিত্রাঙ্গদা'—১৯৩৬, 'শ্যামা'—১৯৩৯) বাঙলাদেশে সুরুচিসম্পন্ন দর্শকসমাজে অতিশয় জনপ্রিয়। এই নৃত্যনাট্যের রচনারীতি, প্রয়োগকৌশল, পরিকল্পনা প্রভৃতি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মৌলিক নাটকের মধ্যে সাঙ্কেতিক নাটকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), ' ফাল্গুনী' (১৯১৬', 'মুক্তধারা' (১৯২৫) ও 'রক্তকরবী' (১৯২৬)—এই সুখ্যাত সাঙ্কেতিক নাটকগুলি (Symbolic Drama) দেশবিদেশে বিশেষভাবে পরিচিত। রূপক নাটক (Allegorical Drama) সংস্কৃত সাহিত্য জনপ্রিয় হইলেও সাঙ্কেতিক নাটক আধুনিক কালের শিল্পপ্রকরণ। এই ধরনের নাটকে ব্যঞ্জনা বা গূঢ় ইঙ্গিতের মারফতে একটি তত্ত্বের আভাস ফুটিয়া ওঠে। তাই ইহার ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে বাহ্যতঃ বিশেষ কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু অন্তরে থাকে তাহার যথার্থ রহস্য। অবশ্য রূপক নাটকের মত সাঙ্কেতিক নাটকে সব কিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকে না। সুগভীর তত্ত্বের অস্পষ্ট ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তোলাই সাঙ্কেতিক নাটকের মূল লক্ষ্য। য়ুরোপের মরিস মেটার-লিঙ্ক্ (১৮৬২-১৯৪৯), স্ট্রীণ্ডবার্গ (১৮৪৯-১৯১২), হপ্ট্মান (১৮৬২-১৯৪৬) প্রভৃতি বিখ্যাত নাট্যকারগণ সাঙ্কেতিক নাটকে নানা ধরনের গভীরতত্ত্বের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিয়াছেন। মেটারলিঙ্কের অধিকাংশ সাঙ্কেতিক নাটক রবীন্দ্রনাথের উক্ত নাটক রচনার পূর্বে প্রকাশ হইয়াছিল। তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্কের সাঙ্কেতিক নাটকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার সঙ্গে মেটারলিঙ্কের গুরুতর পার্থক্য আছে। মেটারলিঙ্কের নাটকে অস্পষ্টতা ও বিষণ্ণতা বড় বেশী স্থান পাইয়াছে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের অন্তরালে অবস্থিত আস্তিক্যবাদী পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়া সমস্ত সংশয়ের জটিলতা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তাই কেহ কেহ বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক কিয়দংশে রূপক নাটকের ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে। সীমাবদ্ধ রূপের পিপাসা মানুষকে ব্যর্থ করিয়া তোলে এবং সীমার আকাঙ্ক্ষা ঘুচিলে তবে অপরূপকে পাওয়া যায় ('রাজা'), প্রথা ও আচারবিচারের চেয়ে মানুষের প্রাণসত্তা অনেক বড় ('অচলায়তন'), মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনেশ্বর অমৃতজীবন দান করেন ('ডাকঘর'), শীত ও

জরা বসন্ত ও যৌবনেরই লীলা মাত্র ('ফাল্গুনী'), যন্ত্রের চেয়ে মানুষ বড় ('মুক্তধারা'), ঐশ্বর্যের কারাগারে বন্দী মানুষ এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের জগতে তাহার উত্তরণ ('রক্তকরবী')—এই সমস্ত তত্ত্বকথা ও জীবনদর্শন তাঁহার সাঙ্কেতিক নাটকে পরিবেশিত হইয়াছে। অবশ্য তত্ত্বকথা উহাদের অভিনয়-মূল্যকে কোথাও হ্রাস করে নাই। তাঁহার 'ডাকঘর', 'রাজা' ও 'রক্তকরবী' নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া য়ুরোপে বিশেষ সমারোহে অভিনীত হইয়াছে।

উপন্যাস ও ছোট গল্প ॥

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি মননশীল সমাজে সুবিদিত। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সমগ্রদেশে যেরূপ প্রচার লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঠিক ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক, ঐতিহাসিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাসের আবেদন এখনও অব্যাহত আছে; শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাঙলার বাস্তবজীবনের অশ্রুসজল ও মর্মন্তুদ বিবরণ আছে, এবং তাহার সঙ্গে অসহায় মানুষের প্রতি সীমাহীন সহানুভূতি রহিয়াছে; এইজন্য তিনি এখনও পর্যন্ত অশেষ জনপ্রিয়তার শীর্ষে সমাসীন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি সাহিত্য হিসাবে অপূর্ব হইলেও বাস্তবজীবনের বস্তুগত শিল্প না হইয়া তাহা অনেকটা কবির জীবনরসে অভিষিক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি'তে (১৯০৩) বঙ্কিম-প্রভাবে ইতিহাসের অনুসরণ আছে। 'চোখের বালি' (১৯০৩) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক উপন্যাস। ইহাতে বিশেষভাবে মনোবিকলনতত্ত্ব (Psycho-analysis) প্রযুক্ত হইয়াছে। বিধবা বিনোদিনীর পুরুষের প্রতি আকর্ষণ এবং তাহার ফলে তাহার মনের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত এই উপন্যাসের মূল কথা। একদা এই উপন্যাসের নৈতিক তত্ত্ব রক্ষণশীল বাঙালী-সমাজকে

বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। পরবর্তী যুগে শরৎচন্দ্র ঐ সমস্যাকে আরও বাস্তব ও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু মনস্তত্ত্ব ও সমাজসমস্যামূলক উপন্যাসের যথার্থ সূচনা 'চোখের বালি' হইতেই হইয়াছে। 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) উপন্যাস হিসাবে কিঞ্চিৎ দুর্বল রচনা। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোরা' (১৯১০) শুধু বাংলা সাহিত্যে নহে, সমগ্র প্রাচ্য সাহিত্যে একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া স্বীকৃত। এই সুবৃহৎ উপন্যাসে একযুগের বাঙলাদেশের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের যথার্থ পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে মহাকাব্যের মত বিপুল বিস্তার আছে বলিয়া ইহাকে মহাকাব্য-গুণান্বিত উপন্যাস (Epic Novel) বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভা 'গোরা' উপন্যাসে আশ্চর্য সফলতা লাভ করিয়াছে। স্বদেশী আমলের সঙ্কীর্ণ জাতিপ্রেমের ক্রটীবিচ্যুতি ও ব্যর্থতা তাঁহার 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) ও 'চার অধ্যায়ে' (১৯৩৪) বিবৃত হইয়াছে। যে জাতিপ্রেম অন্ধ, উগ্র ও দাম্ভিক, তাহাকে রবীন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারেন নাই। সেই সত্য কথাটাই এই দুইখানি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। 'যোগাযোগ' (১৯২৩), 'দুইবোন' (১৯৩৩) ও 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) উপন্যাসে মানবমানবীর হৃদয়সমস্যার নানা জটিলতা বাঙালীর সামাজিকে পরিবেশে উপস্থাপিত হইয়াছে। 'চতুরঙ্গে' (১৯১৬) সাঙ্কেতিকতার সাহায্যে নর-নারীর গভীরতর বাসনা কামনার কথা রূপ পাইয়াছে। তাঁহার সত্তর বৎসর বয়সের রচনা 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। অপরূপ সৌন্দর্যময় পরিবেশ যৌবনের রক্তরাগে আরক্তিম জীবনের পুলকোচ্ছ্বাস এই কাব্যধর্মী উপন্যাসে 'মহুয়া' যুগের প্রেমের অপরূপ বাণীভঙ্গিমায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা বাস্তবধর্মী উপন্যাস নহে, সে আদর্শে বিচার্যও নহে। 'শেষের কবিতায়' বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের যৌবনমূর্তি বিস্ময়কর সজীবতা ও শ্যামলতার প্রাণবন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিপূর্বে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা, আবার তিনিই

ইহার রাজা। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলা ছোটগল্পকে জনপ্রিয় করেন। ছোট গল্প যে বড় গল্প নহে, উপন্যাসের সঙ্কুচিত রূপ নহে, ইহার রচনা ও ধরনধারন সম্পূর্ণ ভিন্ন,—তাহা রবীন্দ্রনাথের তিনখণ্ডে-সম্পূর্ণ 'গল্পগুচ্ছে' স্পষ্ট হইয়া উঠিল। লীরিক কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের লক্ষণগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথের হাতে গল্পগুলি আশ্চর্য কুশলতা লাভ করিয়াছে। তিনি যে যুগে (১৯শ শতাব্দীর শেষে) গল্প রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন য়ুরোপেও ছোটগল্পের রূপ ও রীতি লইয়া নানা সন্দেহ জন্মিয়াছিল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানবজীবন, প্রকৃতিচেতনা, বাঙলার সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ, গীতিপ্রাণতা ও সাঙ্কেতিকতা বিস্ময়কর সফলতা অর্জন করিয়াছে। ছোটগল্পের লক্ষণ বিচারে তাঁহার কোন কোন গল্পে অতিরিক্ত কাব্যসৌন্দর্যের প্রভাব থাকিলেও, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার গল্পে বাঙলাদেশের একটি পরিচিত বাস্তবমূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি গল্পের আঙ্গিক বিষয়বস্তু পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ গল্পের সমকক্ষ। ছোট গল্পকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পার্শ্বেই স্থান পাইয়াছেন।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ ॥

ভারতবাসীরা রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলিয়া থাকেন। শিল্পী সাহিত্যিকের তিনি গুরুস্থানীয় সন্দেহ নাই। আবার তত্ত্বকথা, চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রাধান্য সকলে স্বীকার করিবেন। তিনি প্রধানতঃ কবি ও শিল্পী। কিন্তু তাঁহার মত প্রথম শ্রেণীর গীতিপ্রতিভাও যে চিন্তা, তত্ত্ব ও দার্শনিক অনুশীলনে প্রাধান্য অর্জন করিতে পারে, তাহা তাঁহার গদ্যপ্রবন্ধ পাঠ না করিলে বুঝা যাইবে না। তাঁহার মত কবিপ্রতিভা অতীতেও আবির্ভূত হইয়াছিল, ভবিষ্যতেও হইতে পারে। কিন্তু প্রতিভা ও মননের উৎকর্ষ

একই ব্যক্তির মধ্যে এমন প্রচুর পরিমাণে আর কোন দিন বিকশিত হইবে কিনা সন্দেহ। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম-দর্শন, শিক্ষা, স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র, ডায়েরি —এমন কোন বিষয় নাই যাহা অবলম্বনে তাঁহার অপূর্ব গদ্যপ্রবন্ধগুলি রচিত হয় নাই। 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯৯৭), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) প্রভৃতি সমালোচনা-মূলক গ্রন্থ, 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'রাজাপ্রজা' (১৯০৮), 'স্বদেশ' (১৯০৮), শিক্ষা (১৯০৮), 'কালান্তর' (১৯৩৭) প্রভৃতি রাজনৈতিক চিন্তামূলক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সমাজ, রাষ্ট্র, স্বাদেশিকতার বিষয়ে পক্ষপাতহীন আলোচনায় দেশ ও কালের যথার্থ স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বাদেশিকতা ও শিক্ষার আদর্শ বলিতে কি বুঝায় তাহা তিনি প্রাচীন ভারত ও নবীন য়ুরোপের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে তিনি যে গঠনমূলক বিকাশে বিশ্বাস করিতেন, তাহাই এই সমস্ত আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে বিষয়কে স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাকেই সুন্দর শ্রীময় করিয়া তুলিয়াছেন। ছন্দের পারিভাষিক আলোচনা ('ছন্দ'—১৯৩৬), ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব ('শব্দতত্ত্ব'—১৯০৯, 'বাংলা ভাষা পরিচয়'—১৯৩৮), বিজ্ঞানের আলোচনা ('বিশ্বপরিচয়'—১৯৩৭)—যে কোন বিষয় হোক না কেন, কোথাও শিল্পরূপ ক্ষুণ্ণ হয় নাই; অথচ প্রবন্ধের গুণগত বৈশিষ্ট্যও খর্ব হইয়া যায় নাই। তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে খণ্ডশঃ প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন' (১৯০৯-১৬), 'ধর্ম' (১৯০৯), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ঔপনিষদিক প্রাণরস, মধ্যযুগীয় সন্তদর্শন এবং বাঙলার বাউলরসে নিষ্ণাত রবীন্দ্রনাথ মানবচেতনার গভীরে অবতরণ করিয়া মৃত্যুর পরপারবর্তী অমৃত আত্মার অনন্ত প্রাণপরিক্রমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭) ও 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' (১৯০৭) আদর্শ রচনাসাহিত্য ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হিসাবে পরবর্তি কালের রচনাকারদের বিশেষ

ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কবিচেতনা দার্শনিকতা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নিঃস্পৃহ উদারতা এবং প্রসন্ন উজ্জ্বল পরিহাস একটা বিচিত্র সাহিত্যাস্বাদ সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), 'ছেলেবেলা' (১৯৪০), 'রাশিয়ার-চিঠি' (১৯৩১), 'ছিন্নপত্র' (১৯১২) প্রভৃতি স্মৃতিকথা, ভ্রমণকাহিনী ও চিঠিপত্রাদি শুধু সাধারণ সাহিত্য হিসাবেই নহে, রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রবেশক-রূপে অতিশয় মূল্যবান্। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপঞ্জী নহে। ইহার মধ্যে তাঁহার জীবনের সেই অংশ স্থান পাইয়াছে, যাহার সাহায্যে তাঁহার কাব্য ও মনোদর্শনের মূল রহস্য উদ্ধার করা যায়।

সঙ্গীত রবীন্দ্রজীবন ও সাধনার একটা বড় আশ্রয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতও তাঁহার গীতিপ্রতিভার এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করিতেছে। এই সঙ্গীতে মানুষের দেশকাল-নিরপেক্ষ এমন একটি বাণীমূর্তি ফুটিয়াছে যে, এদেশে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। কালক্রমে মানুষের রুচি পাল্টাইবে, সাহিত্যের নানা প্রকার অদল বদল হইবে; হয়তো ভবিষ্যতে রবীন্দ্রসাহিত্য আধুনিক কালের মত এত জনপ্রিয় নাও থাকিতে পারে। কিন্তু যতদিন মানুষের সৌন্দর্যচেতনা থাকিবে, আনন্দবেদনার হাসিকান্না তাহার অন্তরে দোলা দিবে ততদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত বাঙালীর হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া রাখিবে।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে ও পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্যের গতি থামিয়া যায় নাই; তাঁহার প্রভাব, আদর্শ ও উপদেশে এই সাহিত্য নানা দিকে বিকশিত হইয়াছে। পরবর্তী যুগের অনেক কবি-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক তাঁহার প্রভাবের ছায়াতলে বসিয়া সাহিত্যসাধনা করিয়াছেন, কেহ-বা ভিন্নপথে গিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক হইতে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রতিদিনের সমাজ-জীবনের এমন প্রাণস্পর্শী বর্ণনা এবং দুঃখহত মানুষের প্রতি এত বুকভরা

ভালবাসা ইদানীন্তন কালের সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যদিনে আবির্ভূত হইয়া শরৎচন্দ্র যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার মৌলিকতা প্রমাণিত হইতেছে।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য আরও বেশী জীবন-নিষ্ঠ হইয়াছে; কবি ও লেখকদের অভিজ্ঞতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে; সাহিত্য এখন ঘরের কাছা-কাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, আধুনিক কালে প্রতিদিনের খণ্ডিত জীবনের ভগ্নাংশগুলি বাংলা সাহিত্যে বড় বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মত অখণ্ড জীবন-পিপাসা আধুনিক কালের সাহিত্যিকদেব বিশেষ আকৃষ্ট করে না। বাঙালীর বর্তমান সামাজিক জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ভাঙাগড়া সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যকে অধিকতর প্রভাবান্বিত করিতেছে। সে আরেক যুগের ইতিহাস।

॥ অনুশীলন ॥

১। রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান সুর সম্বন্ধে কি জান? 'গীতাঞ্জলি' ও 'বলাকা' সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। 'গোরা' উপন্যাস কি জন্য বিখ্যাত? ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংক্ষেপে তোমার মতামত দাও। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—'চোখের বালি' ও 'শেষের কবিতা'।

৩। 'রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা'—আলোচনা কর। তাঁহার গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কি জান?

৪। রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা বিচার কর। সাঙ্কেতিক নাটক কাহাকে বলে? রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

৬। রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলন হইয়াছে, একথা কেন বলা হয়?

নির্ঘণ্ট